আমার কৈশোর

রকিব হাসান

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan ও Banglapdf.net এর সৌজন্যে।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

Website : Banglapdf.net

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

অসংখ্য ঘটনা ঘটে একজন মানুষের জীবনে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। মাঝে মাঝে অলস দুপুরে বিছানায় শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে, কিংবা গভীর রাতে লিখতে বসে যখন কারেন্ট চলে যায়, জানালার বাইরে তাকিয়ে ভাবতে থাকি আমার সেই শৈশব, সেই কৈশোরের সোনালি দিনগুলোর কথা। ছবির মত মনের পর্দায় খেলে যেতে থাকে কত কথা কত স্মৃতি। কোনটা হাসির কোনটা বেদনার। কখনও উদার হয়ে যায় মন, কখনও হাহাকার করে ওঠে। বার বার মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা, হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যায়। কিন্তু তা আর যায় না। মনে হয় একটিবার, শুধু একটি বারের জন্যে যদি সে সব দিনে ফিরে যেতে পারতাম! যদি কোনমতে হাতে এসে যেত এইচ. জি. ওয়েলসের টাইম মেশিন, সময়কে পেরিয়ে যে যন্ত্র যে-কোন কালে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে কতই না ভাল হত! কিন্তু তা আর ঘটে না! ভারি হয় শুধু মন। দীর্ঘশ্বাস পড়ে। নিজের অজান্তেই গুনগুন করতে থাকি তখন ঃ দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি···

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্বঃ লেখকের
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪
প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
(সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান)
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

AMAR KOISHORE
By: Rakib Hassan
ISBN-984-462-853-9
মূল্য ॥ সাতাশ টাকা

দীঘির কালো জল

ছেলেবেলাটা কেটেছে আমার ফেনী শহরে। মাস্টার পাড়ায় থাকতাম, সোনা মিয়া হাজারিদের বাড়িতে। আব্বা সরকারি চাকরি করত। দীর্ঘ বারো বছর ছিলাম আমরা সেখানে। সোনা মিয়া হাজারির ছেলে ননু, গনু হাজারির ছেলে কামাল ছিল আমার বাল্যবন্ধু। ওদের সঙ্গে মারবেল খেলতাম, মাছ ধরতাম, গুলতি নিয়ে বেরিয়ে যেতাম পাখি শিকারে।

বাসার কাছেই ছিল বিরাট এক দীঘি। তাতে মাছ ধরতেন আমাদের এক কমন দাদু। স্কুল ছুটি থাকলে সারাটা বিকেলই গিয়ে বসে থাকতাম তাঁর কাছে, আর গল্প শুনতাম। নানা রকম গল্প। দেশ-বিদেশের গল্প। কোলকাতা, বার্মা, অনেক জায়গায় গিয়েছেন তিনি। তাঁর কাছে গিয়ে বসে থাকার আরও একটা বড় লোভ ছিল, গল্পের বই। কোনমতে ভজিয়ে-ভাজিয়ে একটা বই নেয়া, পড়ার জন্যে।

এক গল্প বহুবার করে বলতেন তিনি। যেগুলো বেশি ভাল লাগত আমার, তার মধ্যে একটা ছিল ওই দীঘিরই গল্প। ওটাতে মাঝে মাঝে মানুষ ডুবে মারা যেত। এর কারণ হিসেবে তিনি বলতেন, দীঘির মাঝখানে পানির নিচে *কারেন্ট* আছে।

ওই কারেন্টটা যে কি জিনিস তিনি বুঝতেন কিনা জানি না, তবে আমি বুঝিনি। কেবলই মনে হত বৈদ্যুতিক কোন ব্যাপার-স্যাপার তো পানির নিচে থাকতে পারে না, তাহলে এটা কি? জিজ্ঞেস করতে লজ্জা লাগত, পাছে আবার তিনি বোকা ভেবে বসেন। পাঠক হিসেবে আমাকে তিনি মূল্য দিতেন। তাই জ্ঞানের ব্যাপারে কোন কারণে তাঁর কাছে ছোট হতে চাইতাম না।

যাই হোক, ওই কারেন্টকে আমি ধরেই নিয়েছিলাম ভয়ঙ্কর কোন জলদানব বা জলভূত গোছের কিছু। সুতরাং ভয়ে ভয়ে থাকতে হত। কখন এসে সেই *আজব কিছুটা* আমাকেও ধরে। তাই বলে পানিতে দাপাদাপি বন্ধ থাকত না আমার। স্কুল খোলা থাকলে তো বেশিক্ষণ পারতাম না, কয়েকটা সাঁতার, আর গোটা পঞ্চাশেক ডুব দিয়েই উঠে চলে আসতে হত। কিন্তু বন্ধ থাকলেই হয়েছে। সেই সকাল নটা-দশটায় গিয়ে যে নামতাম, আর ওঠার নাম নেই। দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়ে যেত। তিনটে বেজে গেলে আম্মা আর থাকতে না পেরে অস্থির হয়ে কাজের ছেলেটাকে পাঠাত আমাকে ডাকতে।

আমি এতক্ষণ পানিতে কি করেছি, নিশ্চয় প্রশ্ন জাগছে মনে? শুরুতে, আর কয়েকজন ছেলের সঙ্গে একটা বিশেষ খেলা খেলেছি। খেলাটার একটা স্থানীয় নাম আছে, *বস্নি* । কয়েকজনে মিলে পানিতে ছোটাছুটি করবে, আর একজন তাদেরকে ছোঁয়ার চেষ্টা করবে। যাকে ছুঁয়ে দেবে সে তখন আবার অন্যদেরকে ছোঁয়ার চেষ্টা করবে।

এরকম খেলে ঘণ্টা দুই কাটানোর পর ওরা উঠে যেত। আমি উঠতাম না। ভেজানোর জন্যে প্রচুর বাঁশ ফেলে রাখা হত দীঘির পানিতে। কিংবা আস্ত কলাগাছ

কেটে ফেলে দেয়া হত পানি পরিষ্কার রাখার জন্যে। তারই কোন একটা সম্বল করে ভেসে থাকতাম পানিতে—কখনও তার ওপর বসে, কখনও চিত হয়ে শুয়ে। কখনও ভেলার মত তাতে চড়ে হাতকে দাঁড় বানিয়ে এপার-ওপার করতাম, কখনও মাঝদীঘিতে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকতাম আকাশের দিকে তাকিয়ে। কারেন্টের ভয় সারাক্ষণই থাকত মনে, তবে তেমন গুরুত্ব দিতাম না। মাঝে মাঝে ভয় হত, এই বুঝি মাটির বাসা থেকে বেরিয়ে দীঘির কাজল কালো পানির গভীরতা ভেদ করে আমাকে নিতে আসছে কারেন্ট। আমার কল্পনায় ওটা ছিল কালো রঙের এক অতিকায় সিন্দুক। যার লম্বা শেকল আছে। সেটা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে টেনে নিয়ে শিকারকে ভরে ফেলে নিজের পেটে। চলে যায় নিজের বাড়িতে। তারপর মানুষগুলোকে কি করে কে জানে! গোলাম-টোলাম বানিয়ে রাখে না, এটা ঠিক। খেয়েও ফেলে না। তাহলে যারা ডুবত তারা আর ভেসে উঠত না। নিশ্চয় বনিবনা হয় না, তখন রাগ করে মেরে ফেলে। ভাবতাম, আমাকে ধরলে সিন্দুকের অবাধ্য হব না, যা বলবে তাই করব। তাহলে হয়তো খুশি হয়ে আমাকে পানির নিচে এক অচীনপুরিতেও নিয়ে যেতে পারে। যেখানে রয়েছে এক অসাধারণ রাজ্য। যেখানে বাস করে পরীরা। সোনার গাছে হীরার ফুল ফোটে, সোনালি টিয়ে খুঁটে খায় মোতির ফল। রূপকথার গল্পের মত। ভাবতাম, ওরকম রাজ্য ছেড়ে কোনও দিন আর আসব না আমি। ওদেরকে অনুরোধ করে থেকে যাব ওদেরই দেশে। কে যায় স্কুলে পণ্ডিত স্যার আর মওলানা স্যারের বেতের বাড়ি খেতে? আমি না এলে আম্মার খুব শিক্ষা হবে। বকাবকি আর সময়ে-অসময়ে কানমলা, নারকেলের শলার বাড়ি চর্চা করার লোক পাবে না তখন।

তবে একটা কাজ করব, ভাবতাম। মার্ক টোয়েনের টম সয়্যারের মত রাতের বেলা চুপিচুপি উঠে চলে আসব পানি থেকে। টম দ্বীপ থেকে নদী পেরোত সাঁতরে, আমি অচীনপুরি থেকে আসব সিন্দুকে করে। ওটা তখন আর ক্ষতি করে না আমার, বাহন এবং বন্ধু হয়ে গেছে। বাসায় এসে দেখব আম্মা কি করছে। শুনব, কাঁদছে আর আফসোস করছে এতদিন আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্যে। কেঁদে কেঁদে আপাকে বলছে ঃ *ছেলেটা খারাপ ছিল না। না হয় একটু-আধটু দুষ্টুমি করতই। তাতে কি? অযথাই মেরেছি ওকে, কারণে-অকারণে শাস্তি দিয়েছি...।* আমার তখন মনে হবে, কেমন মজা! এখন, বোঝো! মন নরম হয়ে যাবে আমার। কিন্তু দেখা দেব না। সরে চলে আসব। কারণ, ঠিকই তো করে ফেলেছি, আর কোনদিন ঘরে ফিরে যাব না। পরীর রাজ্যে থেকে কথার নড়চড় করা চলে না।

শুধু যে পরীর রাজ্যে যাওয়ারই স্বপ্ন দেখতাম তা নয়। আরও অনেক জায়গায় যেতে ইচ্ছে করত। ভাবতাম, আহ্, বড় হয়ে যদি দস্যু বাহরামের মত ডাকাত হতে পারতাম! কিংবা আফ্রিকার বনের রাজা টারজান!

আমি যখন পানিতে নামতাম, তখন অনেক মানুষ গোসল করতে আসত। হইচই কথাবার্তা চলত। কখন যে সে সব থেমে যেত, নীরব হয়ে আসত আশপাশটা অনেক সময়ই টের পেতাম না। আমি হয়তো তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে কিংবা চোখ মুদে বাঁশের ওপর ভাসছি আর ভাবছি। একটা মাত্র বাঁশ সম্বল করে তার ওপর ভেসে থাকার কৌশলটা রপ্ত করেছিলাম ভালই। চমক ভাঙত কাজের ছেলেটার ডাকে, 'দাদাগো,

আমনে এহনও পানিত! আর আম্মায় অই দিকে চিন্তায় বাঁচে না!'

কি আর করব? উঠে আসতেই হত।

ওই দীঘিতে অনেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। দুটোর কথা বলি।

দীঘির দুই কোণে দুটো সিঁড়ি ছিল। অনেক পুরানো। একটা সিঁড়ি অনেক বড়, প্রায় তিরিশ-চল্লিশ ধাপের। কিংবা বেশিও হতে পারে। মনে নেই। সম্ভবত ফাল্গুন-চৈত্র মাসের দিকেই পানি অনেক নিচে নেমে যেত। বেরিয়ে পড়ত সিঁড়ির অনেক ধাপ। ডুব দিয়ে সহজেই একেবারে শেষ সিঁড়িটার কাছে চলে যেতে পারতাম। সিঁড়ির তলায় ভেতরের দিকে মাটি খসে গেছে পানিতে ভিজে ভিজে। বিরাট এক ফোকর হয়ে আছে। তার ভেতরেও পানি। প্রায়ই ওই ফোকরটার কাছে চলে যেতাম। দেখে ভয় লাগত আবার লোভও হত ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে। মনে হত, ঘড়া ঘড়া সোনার মোহর নিশ্চয় লুকানো রয়েছে ওর ভেতরে।

অনেক দিন কাছে গিয়ে ফিরে আসার পর আরেকদিন আর কৌতূহল দমাতে পারলাম না কিছুতেই। যা থাকে কপালে ভেবে ঢুকে পড়লাম। পানি আর ফুরায় না। আচমকা ভয় পেয়ে যাওয়ায় দম ফুরিয়ে গেল অসময়েই। মাথা ঠাণ্ডা রাখার প্রশ্নই ওঠে না। চিন্তার ক্ষমতা গুলিয়ে গেল। ফেরত যাব, না কি করব, ঠিক করতে পারলাম না। তবে একটা কাজ বহাল রেখেছিলাম, ওপরে ঠেলে ওঠা। যখন মনে হলো আর পারব না, ফুসফুস ফেটে যাবে, এই সময় ভুস করে ভেসে উঠল মাথা। শ্বাস নিয়ে বাঁচলাম।

ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই চোখে পড়ল না। ততক্ষণে দেখার আগ্রহও আমার ফুরিয়েছে। ফিরে যেতে হবে এবার। লম্বা দম নিয়ে আবার দিলাম ডুব। নিরাপদেই বেরিয়ে আসতে পারলাম।

কতটা বোকামি করেছি ওই ফোকরে ঢুকে, তখন বুঝতে পারিনি। পরে, অনেক পরে যখন ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেছি, শিউরে উঠেছি ভয়ে। অনেকগুলো ভয়াবহ বিপদ ঘটতে পারত। ভেতরে পানির ওপরে ফাঁপা জায়গা না-ও থাকতে পারত। তাহলে আর ভেসে উঠতে পারতাম না। মাটিতে কিংবা সিঁড়িতে ঠেকে যেত মাথা। দম ফুরিয়ে গেছে তখন। ফিরেও আসতে পারতাম না। আবার বাতাসে অক্সিজেনও না থাকতে পারত। তার বদলে থাকতে পারত কোন মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস। বন্ধ জায়গায় যেমন থাকে। তাহলে বাঁচতে পারতাম না। আরেকটা কথা ভাবলে রোম দাঁড়িয়ে যায়। ওখানেই মরে পড়ে থাকতাম, কেউ আমাকে কোনদিন খুঁজে পেত না, আমার লাশও না। কেউ কল্পনাই করতে পারত না, আমি ওই ফোকরের ভেতর গিয়ে ঢুকেছি।

ফোকর আবিষ্কার করে লুকানোর একটা দারুণ জায়গা পেয়ে গেলাম। পানিতে বল্লি খেলার সময় কেউ তাড়া করলেই ডুব দিয়ে গিয়ে ওর ভেতরে ঢুকে পড়তাম। আরেকটা প্রিয় খেলা ছিল আমাদের—ডুব দিয়ে কে কত বেশি সময় পানির নিচে থাকতে পারে। স্বভাবতই আমি সবাইকে হারিয়ে দিতাম, শুধু হারিয়ে দেয়াই না, তাজ্জব করে দিতাম। কারণ যতক্ষণ ইচ্ছে আমি ডুবে থাকতে পারতাম। আসলে তো ঢুকে থাকতাম ফোকরের ভেতরে। রহস্যটা কাউকে জানতে দিইনি। আরেকটা ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকতাম, বড়রা কেউ কাছাকাছি থাকলে ওই প্রতিযোগিতায় যেতাম না। তাহলে আমি নিশ্চিত, ওরা

ব্যাপারটা ধরে ফেলত।

এসব প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। আজও সিঁড়ির নিচের সেই ফোকর আছে কিনা জানি না। হয়তো মাটিতে ভরাট হয়ে গেছে, কিংবা দিনে দিনে সিঁড়ি নেমে গিয়ে কিংবা ভেঙে গিয়ে ফোকরের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। কিংবা হয়তো আরও বড় হয়েছে। আমার অনুরোধ, মাস্টার পাড়া হাজারি বাড়ির কোন কিশোর যদি আমার এই লেখা পড়ো, তাহলে ওই সিঁড়ির ফোকরে ঢুকতে চেষ্টা কোরো না আমার মত। কারণ, তখন বুদ্ধি পাকেনি, বুঝিনি, কি সাংঘাতিক কাণ্ড আমি করতাম! আমি চাই না, আমাকে অনুসরণ করে দুষ্টুমি করতে গিয়ে কোন কচি প্রাণ অকালে ঝরে যায়।

এবার দ্বিতীয় ঘটনাটার কথা বলি। দীঘির অন্য কোণের ছোট সিঁড়িটার কাছ থেকে একটু দূরে একটা কাঁঠাল গাছ ছিল। বেশি বড় না গাছটা। একেবারে পুকুরের পাড়ে ছিল। বড় একটা মোটা ডাল চলে এসেছিল পানির ওপরে। তাতে উঠে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়া একটা মজার খেলা ছিল আমাদের। গাছটা ছিল এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের। খুব গরিব ছিলেন। দুটো চোখই নষ্ট ছিল। একটা পুরোপুরি নষ্ট, আরেকটা দিয়ে অল্প অল্প দেখতে পেতেন। বই-খাতা একেবারে চোখের সামনে নিয়ে এসে দেখতেন। লেখাপড়া খুব বেশি করেননি, তবে অ আ ক খ-র ছেলেদের জন্যে খুব ভাল শিক্ষক ছিলেন। আমাকেও তিনি অনেক দিন পড়িয়েছেন। যখন আমি অনেকটা বড় হয়েছি, তাঁর বেতের আওতার বাইরে চলে গেছি, তখনও প্রায়ই তিনি আসতেন আমাদের বাসায়। বলতেন, তোর পড়ালেখা কেমন হচ্ছে দেখতে এলাম। আসলে যে কেন এসেছেন, তা তো আমি জানতাম। আম্মা খবর পেলে চা-নাস্তা পাঠিয়ে দিত। আর রান্নাঘরে (রান্নাঘরটা আলাদা ছিল) বা অন্য কোথাও ব্যস্ত থাকলে আমি ইচ্ছে করেই তাকে খবর দিতাম না। অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে শেষে উসখুস করে বলেই ফেলতেন কানা মাস্টার (ওই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন), 'কি রে, আম্মা নেই ঘরে? চা-নাস্তা তো এখনও পাঠাল না।'

এই কথাটার জন্যেই অপেক্ষা করতাম। মুচকি হেসে উঠে চলে যেতাম আম্মাকে বলার জন্যে। বলতাম, কি ভাবে বসিয়ে রেখেছি কানা মাস্টারকে। ভীষণ বকুনি লাগাত আমাকে আম্মা। বুঝতাম না তখন, কি এমন অন্যায়টা করেছি। মনে হত ছোট হওয়ার এই এক জ্বালা। এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না, এতে অন্যায়, ওতে দোষ···যাকগে, আসল কথায় আসি।

কাঁঠাল গাছে রোজ একপাল ছেলে উঠে অত্যাচার করলে গাছের ক্ষতি হবে, এই আশঙ্কায় লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতেন কানা মাস্টার। ওরকম একজন বুড়ো মানুষকে কে পরোয়া করে? আমরাও করতাম না। তিনি এক দিক দিয়ে আসতেন আমরা আরেক দিক দিয়ে ছুটতাম। এরই মাঝে চলত ডালে ওঠা আর পানিতে লাফিয়ে পড়া। কিছুতেই ঠেকাতে পারতেন না তিনি। দারুণ রোমাঞ্চকর হয়ে উঠত আমাদের খেলা।

যাই হোক, একদিন, ওরকম খেলছি। সেদিন আমরা লোক কম। দু-তিন জনের বেশি হব না। কানা মাস্টারও খবর পাননি। আমাদের খেলা তেমন জমে ওঠেনি। হট্টগোলই যদি না হলো, মজা কিসের?

ওয়ান টু থ্রী বলে একে একে লাফিয়ে পড়ছি আমরা। খাড়া হয়ে পড়ছি। পা সোজা

করে নেমে যাচ্ছি অনেক নিচে। মাটি ছোঁয়ার চেষ্টা করছি। পারছি না কিছুতেই। অনেক গভীর ওখানটায়। তাছাড়া তখন বর্ষাকাল। কানায় কানায় ভরে গেছে দীঘি।

সোজা হয়ে নামার সময় হঠাৎ আমার এক পায়ে কি যেন লাগল। যখন বুঝলাম, তখন আটকে গেছে পা-টা। কিসে যেন ধরেছে! টান দিয়ে ছাড়াতে পারি না।

ভয়ে কেঁপে উঠল বুক। কারণ কিসে ধরেছে, আমি বুঝে ফেলেছি! নিশ্চয় কোন তামার কলস। যেগুলোতে সোনার মোহর ভরা থাকে। আর যেগুলো ভূতুড়ে হয়ে যায়। মানুষ, বিশেষ করে ছোটদের পেলে তাদের আটকে নিয়ে মেরে ফেলে। তারপর কলসির যক বানিয়ে রাখে।

পলকে অসংখ্য দৃশ্য খেলে গেল মাথায়। কি করবে আন্দাজ করে ফেললাম। মনে পড়ল, দাদীর হুঁশিয়ারি, খবরদার, পানিতে বেশি নামবি না। কোন্ দিন কলসের খপ্পরে পড়বি। তাহলে আর উঠে আসতে হবে না। আমি ভাবতাম, আমি যাতে পানিতে বেশি না থাকি, সে জন্যে আমাকে ভয় দেখায় দাদী। পাত্তাই দিতাম না। কলসে ধরার পর আফসোস হতে লাগল, হায়, হায় কেন দাদীর কথা শুনলাম না! তাহলে তো এখন মরে গিয়ে যক হয়ে থাকতে হত না কলসির মধ্যে! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করার চেষ্টা করলাম। পানির নিচে স্বর ফুটল না। মরিয়া হয়ে লড়াই শুরু করলাম কলসের সঙ্গে। ওটা টানে নিচের দিকে, আমি টানি ওপর দিকে। শেষে আমারই জয় হলো। আমার সঙ্গে গায়ের জোরে পারল না কলস। উঠে এল পায়ের সঙ্গে আটকে থেকে।

পানির ওপরে মাথা তুলে চেঁচাতে শুরু করলাম। দেখি, কানা মাস্টার তখন পৌঁছে গেছেন। বেত নিয়ে তাড়া করছেন একটা ছেলেকে। থমকে দাঁড়ালেন তিনি। আমি চেঁচাচ্ছি, *কলসে ধরেছে আমাকে, কলসে!* তিনি কি বুঝলেন কে জানে, তবে চেঁচাতে শুরু করলেন। লোক ডাকাডাকি শুরু করলেন আমাকে বাঁচানোর জন্যে। নিজে তো অক্ষম।

আমাকে তোলা হলো, সেই সঙ্গে কলসিটাও। সবাই তো হেসেই খুন। মোহর-টোহর কিচ্ছু নেই। পানি ভরে ভারি হয়ে গিয়েছিল। বছরখানেক আগে হারিয়ে যাওয়া লাতুর মায়ের কলসি। কি জানি কিভাবে পুকুরে হারিয়ে গিয়ে ছিল ওটা।

মাথা যখন গরম হয়ে যায় মানুষের, উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে। আমারও হয়েছিল সেই অবস্থা। মাথা ঠাণ্ডা রাখলে কিন্তু আমি সহজেই মুক্তি পেয়ে উঠে আসতে পারতাম। লাফ দেয়ার সময় পায়ের পাতা ছিল সোজা, আঙুলগুলো নিচের দিকে টানটান করা, ফলে ঢুকতে পেরেছিল কলসির মুখের ভেতর দিয়ে। কিন্তু নামার পর যেই পাতা স্বাভাবিক করেছি, অমনি আটকে গেল ওটা কলসির গলায়। প্রচণ্ড আতঙ্কে চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছিল। নইলে পায়ের পাতা নিচের দিকে করে সহজেই বের করে ফেলতে পারতাম, যত সহজে ঢুকিয়েছি। ভয়, ভয়ই অনেক সময় সহজ বিপদ থেকেও বাঁচতে দেয় না মানুষকে। আর মানুষই বা শুধু বলি কেন? জন্তু-জানোয়ারের বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে বানর ধরা হয় এই ভয় আর লোভের ফাঁদে ফেলে। বোতলের ভেতর গোল ফল রেখে বোতলটা বেঁধে রাখা হয় গাছের ডালে। লোভে পড়ে ফল নেয়ার জন্যে বোতলের মুখের ভেতর হাত ঢোকায় বানর। বের করে আনার চেষ্টা

করে। আঙুল সোজা থাকায় যে হাতটা বোতলের ভেতর সহজে ঢুকে গিয়েছিল, খাবার ধরা সেই হাতই মুঠোবদ্ধ হয়ে আর বেরোতে চায় না। আটকা পড়েছে ভেবে ভীষণ ভয় পেয়ে যায় বানর। ভয়ে খাবার ছেড়ে আঙুল সোজা করে নেয়ার কথাও আর মনে থাকে না। টানাটানি শুরু করে, চেঁচাতে থাকে। কাছেই থাকে শিকারী। এসে ধরে ফেলে।

আমাজানের জঙ্গল থাক, বলতে বসেছি আমার ছেলেবেলার কথা। সেই কথাই বলি।

বাড়ি থেকে বহুদূর

খুব নিচের ক্লাসে পড়ি তখন। বাসা থেকে বেরিয়ে একা একা কোথাও যাওয়া নিষেধ। একা কেবল স্কুলে যাওয়ার অনুমতি ছিল। আর যেতে পারতাম দীঘির চারপাশের আমার বন্ধুদের বাড়িতে। নানা রকম ভয় দেখানো হত আমাকে। একলা বাড়ি থেকে বেরোলে ছেলেধরায় নিয়ে যাবে, হাত-পা ভেঙে পঙ্গু করে ভিক্ষে করাবে, রক্ত, কিডনি, চোখ এসব খুলে নিয়ে বিক্রি করে দেবে বিদেশীদের কাছে, এমনি নানান ভয়। বিশ্বাস করতাম না। আমার চোখের সামনেই দেখতাম, আমার চেয়ে কম বয়েসী ছেলেরা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে যেখানে সেখানে। আমার চেয়ে স্বাস্থ্য ওদের কারোরই খারাপ না। তাহলে ওদেরকে ধরে নিয়ে যায় না কেন? ছেলেধরারা যেন আমাকে ছাড়া আর কাউকে চোখে দেখে না। আমার আর কোন ভাই না থাকায় ভীষণ রাগ হত তখন আল্লাহর ওপর। কেন আরেকটা ভাই দিল না? তাহলেই তো আর আমাকে নিয়ে অত ভয় থাকত না আম্মার। অত বাধা দিত না। যাই হোক, বেশি দূরে যেতে সাহস পেতাম না। ছেলেধরার ভয়ে নয়, আম্মার নারকেলের শলার ভয়ে।

কিন্তু ওই ভয় আর কতদিন থাকে? একদিন ভয় কাটালাম।

স্কুল ছুটি। সম্ভবত দুর্গাপূজা কিংবা গরমের ছুটি হবে, ঠিক মনে নেই। পড়ারও চাপ নেই। সকাল বেলায়ই বেরিয়ে পড়লাম বাসা থেকে। খানিকক্ষণ অহেতুক ঘোরাফেরা করলাম দীঘির পাড়ে। কথা বলার কাউকে পেলাম না। ননু, কামাল, কাশেম, কচি, শওকত, কেউ নেই। হতাশ হয়ে এসে বসলাম দীঘির ঘাটে। যদি কেউ আসে।

কেউ এল না। গেল কোথায় আজ ওরা সব? ঘাটে বসে বসে দেখছি, শান বাঁধানো সিঁড়ির কাছে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে শত শত ডানকানা মাছ। বেলে মাছগুলো ভালমানুষ সেজে এসে চুপটি করে শুয়ে পড়ছে সিঁড়িতে। মনে হয় কিচ্ছু জানে না। পানিতে হাত ডুবিয়ে চেপে ধরলেও কিছু বলবে না। কিন্তু আমি জানি, ধরতে গেলেই চোখের পলকে সুড়ুৎ করে ছুটে পালাবে। কাজেই সে চেষ্টা করলাম না।

কিন্তু মাছগুলো ক্রমশ লোভ দেখাতে লাগল আমাকে। ভাবলাম, যাই, দুপয়সা দিয়ে একটা বড়শি কিনে ছিপ বানিয়ে নিয়ে আসি।

ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি প্রায়, এই সময় সেখানে এসে হাজির ইদ্রিস আলী ওরফে আমাদের অনেকেরই ইদ্রিস ভাই। পড়ালেখা বিশেষ করেনি, খালি বাউণ্ডুলেপনা

করে বেড়ায়। সে জন্যে কেউ দেখতে পারে না তাকে। ইদ্রিস ভাইয়ের আব্বাও না। অনেক চেষ্টা করেছেন ছেলেকে ভাল করার। হয়নি দেখে রেগেমেগে শেষে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। নীরবে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদেন ইদ্রিস ভাইয়ের আম্মা, ছেলের জন্যে। আব্বা যখন বাজারে দোকানে চলে যান, তখন লুকিয়ে-চুরিয়ে বাড়িতে আসে ইদ্রিস ভাই। মায়ের কাছে ভাত চায়। তাড়াতাড়ি নাকেমুখে গুঁজে দিয়ে বাপ আসার আগেই পালিয়ে যায় আবার। রাত কাটানোর কোন ঠিকঠিকানা নেই। যেখানে সুযোগ পায় শুয়ে থাকে। পাড়ার গার্জেনরা কেউ দেখতে পারে না তাকে।

কিন্তু এহেন ইদ্রিস ভাইকে আমার ভারি পছন্দ। প্রচণ্ড স্বাধীন মনে হয় তাকে। যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াতে পারে, বাধা দেয়ার কেউ নেই। আমার মত বন্দি নয়। বেশি ভাল লাগে তার গল্প শুনতে। অনেক রোমাঞ্চকর গল্প জানা আছে তার, অনেক অভিজ্ঞতা। কি জানি কেন, তাকে পছন্দ করি বলেই হয়তো, কিংবা তার গল্প মন দিয়ে শুনি বলে, আমাকেও ভালবাসে ইদ্রিস ভাই।

অনেক ভূতের গল্প জানে সে। শ্মশানের ভূত, তাল আর তেঁতুল গাছের জিন, আন্ধা-পুকুরের মেছোজিন, মোট কথা এমন কোন জিন-ভূত নেই, যার সঙ্গে ইদ্রিস ভাইয়ের সাক্ষাৎ হয়নি।

প্রচণ্ড গরমের দিনে গরম সইতে না পেরে সন্ধের দিকে দীঘির ঘাটে গিয়ে বসেছি একদিন। ওখানে ফুরফুরে বাতাস। বিশাল চাঁদ উঠেছে পুবের আকাশে। জ্যোৎস্নায় ঝিলমিল করছে পানি, দিনের বেলা যা কুচকুচে দেখায় কোন জাদুর বলে সেটা হয়ে গেছে রুপালি। ভূতের গল্প শোনার জন্যে চমৎকার পরিবেশ। ইদ্রিস ভাই বসে আছে সেখানে, একা। বায়না ধরলাম, 'ইদ্রিস ভাই, একটা ভূতের কিচ্ছা বলেন না। ওই যে নান্দু ফকিরের ভূতের কিচ্ছাটা…'

মুচকি হাসল ইদ্রিস ভাই। 'ভূতের গল্প শুনবি? তো ওই পুরানোটা কেন? দাঁড়া, আজকে একটা মেছোভূতের গল্প শোনাব।'

'মেছোভূত?'

'হ্যাঁ। দুলালদের পুকুরের।'

চমকে গেলাম। ওই পুকুরটার অনেক বদনাম। চারপাশে গাছপালা, শিমুল গাছ আছে অনেক। কালো পানি। রোদের চেয়ে ছায়াই বেশি থাকে। ফলে দেখলেই ভয় ভয় লাগে। পুকুর, দীঘি এসব বদ্ধ জলাশয়ের ব্যাপারে আমার যেমন আকর্ষণ, তেমনি একটা ভয়ও আছে। ছোটবেলায় নানীর কাছে ভূতুড়ে সিন্দুকের গল্প শুনতে শুনতে একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল আমার, আন্ধা-পুকুর মানেই ভূতুড়ে সিন্দুকের বাসস্থান। সিন্দুকেরা কেন ভূত হয়, তারও একটা চমৎকার ব্যাখ্যা আছে নানীর। অনেক কিপটে লোক সোনা-রূপা টাকা-পয়সা সিন্দুকে ভরে রাখে, খরচ করে না। দামী জিনিস বদ্ধ জায়গায় অনেক দিন আটকে রাখলেই নাকি সেগুলোর ওপর জিনের আসর হয়ে যায়। আর তখন ঘরে থাকতে চায় না। কাছাকাছি পুকুর থাকলে সিন্দুকটাকে নিয়ে ঘরের বেড়া ভেঙে হলেও পানিতে গিয়ে পড়বে। ধীরে ধীরে সে সিন্দুকের শেকল গজায়। পানিতে মানুষ নামলেই আস্তে করে শেকল এসে পেঁচিয়ে ধরে তার পা। এত আলতো করে ধরে প্রথমে কিছু

বুঝতেই পারে না মানুষ। কিন্তু যখন বোঝে, তখন আর কিছু করার থাকে না। টেনে নিয়ে চলে যায় তাকে সিন্দুক। তারপর তাকে কি করে সেটা আর কেউ জানে না। ফলে শুধু যে পানির সিন্দুক তাই নয়, কারও ঘরে চাকাওয়ালা কালো রঙ করা যে কোন সিন্দুক দেখলেই তার কাছ থেকে দশ হাত দূরে থাকতাম আমি।

দীঘির সিন্দুকের এরকম গল্প অবশ্য বাংলাদেশের অনেক জায়গায়ই শোনা যায়। ফেনী শহরের কাছেই আরেকটা দীঘি আছে, তার নাম বিজয় সিং দীঘি। অনেক উঁচু উঁচু পাড়। ওখানে দাঁড়িয়ে পানির দিকে তাকালে সত্যিই ভয় লাগে, আমার তো অন্তত লাগে। ওই দীঘিটা নিয়েও অনেক কিংবদন্তী আছে, সিন্দুকের গল্প চালু আছে। বহুদিন আগে নাকি কোন এক জমিদারের ছেলে নতুন বৌকে নিয়ে চলেছিল ওই দীঘির ধার দিয়ে। পিপাসা পেল বৌয়ের। পানি খেতে নামল দীঘিতে। তার পা এসে পেঁচিয়ে ধরল চুলের মত সরু শেকল। ভয় পেয়ে পানি থেকে উঠে এল বৌ। তারপর শুরু হলো সেই শেকল টেনে তোলার পালা। যতই টানে ততই ওঠে, যতই টানে ততই ওঠে, শেষ আর হয় না। কাটতে গেলে কাটে না, এতই শক্ত। বরং কোপ দিলেই ফোঁস ফোঁস শব্দ করে আর আগুন বেরোতে থাকে তা থেকে। সাতদিন পর স্বপ্নে দেখল জমিদারের ছেলে, শেকল তোলার চেষ্টা করে লাভ নেই, বরং এরকম করতে থাকলে তার বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে। দীঘি যা চাইছে সেটা তাকে দিয়ে দেয়াই ভাল। কি আর করবে? হাল ছেড়ে দিল বেচারা। একটানে তার বৌকে পানিতে নামিয়ে নিয়ে গেল শেকল। তারপর থেকেই নাকি মাঝে মাঝে দীঘির একটা বিশেষ কোণে গিয়ে পানিতে তাকালে অপূর্ব একটা সুন্দরী মেয়েকে দেখা যায়, কখনও ঘুরে বেড়াতে, কখনও চুল আঁচড়াতে। বড় হয়ে, বাড়ি থেকে একলা বেরোনোর অনুমতি পাওয়ার পর বহুবার গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওই দীঘির পানির দিকে তাকিয়ে থেকেছি আমি, মেয়েটাকে খুঁজেছি, কখনও দেখতে পাইনি।

ইদ্রিস ভাইকে বললাম, 'ওই পুকুরটাতে নাকি সিন্দুক আছে, শুনেছি?'

'আছে। রাতের বেলা ভেসে ওঠে। নীল আলো জ্বলে।'

দৃশ্যটা কল্পনা করে নিজের অজান্তেই গায়ে কাঁটা দিল আমার। বললাম, 'বলেন।'

'দাঁড়া, একটা বিড়ি ধরিয়ে নিই,' বলতে বলতেই কোমরে হাত দিল ইদ্রিস ভাই। একটা চ্যাপ্টা টিনের বাক্সে পাতার বিড়ি আর ম্যাচ রাখে।

বিড়ি ধরিয়ে জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে শুরু করল, 'গরমও পড়েছে সেদিন। এমন গরমের গরম, গায়ে কাপড় রাখতে পারি না। দুলালদের পুকুর পাড়টায় খুব ঠাণ্ডা। গিয়ে বসলাম মাদার (শিমুল) গাছের নিচে। দেখি, মাছে বড় বড় ঘাই মারে। আর বছর রুই-কাতলার পোনা জিইয়েছিল, সেগুলোই বড় হয়েছে। এছাড়াও আগের পুরানো অনেক মাছ আছে পুকুরটায়। দিনের বেলা বড়শি কিংবা জাল নিয়ে গেলে লুঙ্গি কাছা মেরে লাঠি নিয়ে তাড়া করবে দুলালের আব্বা। ঠিক করলাম, রাতেই কাজটা সারব।

'বাড়ি এসে নতুন জালটায় গাবের কষের মাঞ্জা লাগানো শুরু করলাম। মাঞ্জা লাগালে সুতা শক্ত হয়, বড় মাছেও আর সহজে ছিঁড়তে পারে না। লাগিয়ে, শুকিয়ে-টুকিয়ে রেডি করে রাখলাম। রাতে সকাল সকাল খেয়ে ফেললাম সেদিন। তখন জাল বের করতে দেখলেই আব্বা শুরু করবে চেঁচামেচি। ঘাটলায় এসে বসে রইলাম। সবাই

ঘুমিয়ে পড়লে পা টিপে টিপে গিয়ে বের করে আনলাম জালটা, তারপর সোজা রওনা হলাম দুলালদের পুকুরের দিকে।

'দুলালদের বাড়িঘরও সব অন্ধকার। ওরাও সব ঘুমিয়ে পড়েছে। তবু একটা মাদার গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ। বলা যায় না, দুলালের বাপ হয়তো তখনও ঘুমায়নি। অনেক রাত পর্যন্ত নামাজ-কালাম পড়ে তো।

'দিনের বেলাতেই পুকুরটার পানি যেন কেমন লাগে, দেখিসনি? আমার জানামতেই দু-তিনজন ডুবে মরেছে। তা-ও গেছি, কেবল বড় মাছের লোভে। দুনিয়ার যত আজেবাজে পাখির বাসা ওখানে। একটা পেঁচা ডাকতে শুরু করল একেবারে মাথার ওপর। ঘুপুৎ ঘুপুৎ করে একটু পর পরই এখানে ওখানে মাছে ঘাই মারে।

'একটা যমকুলি ডেকে উঠল। চিনিস পাখিগুলোকে? লাল লাল চোখ, যেন শয়তানের চ্যালা। কাকের মতই দেখতে অনেকটা, তবে ঠোঁট অন্য রকম, পালকগুলো বাদামী। কারও বিপদ দেখলেই নাকি টের পেয়ে যায় ওরা, ডেকে ডেকে হুঁশিয়ার করে। একবার কলেরায় মানুষ মরা শুরু করেছিল, সেই বছর সারারাত খালি ওই পাখির ডাক শুনেছি। পুকুর পাড়ে ওটার ডাক শুনে ঘাবড়ে গেলাম। মনে হতে লাগল, আজ বিপদেই পড়ব, ফিরেই যাই।

'যাওয়ার কথা ভাবছি, হঠাৎ ঘুপ্পুৎ করে এমন জোরে এক ঘাই মারল একটা মাছ, আমার পায়ের কাছ থেকে এই কয়েক হাত দূরে। লেজের বাড়ি দেখেই বুঝে গেলাম, রুই মাছ। পাখি-পুখি সব উধাও হয়ে গেল মাথা থেকে, ভূতের ভয়ও গায়েব। মাছের নেশা বড় নেশা। এই সুযোগ ছাড়া যায় না। জাল ঘুরিয়েই মেরে দিলাম।

'কিন্তু মেরে তো দিলাম, তারপর থেকেই যা শুরু হলো না! টেনে জাল আর তুলতে পারি না। হ্যাঁচকা টান লাগল। টানটা কেমন বোঝাতে পারব না। মনে হলো একটা দৈত্য-টৈত্য কিছু আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। ইয়া বড় বড় ভোগলা (মাছের মুখ দিয়ে পানিতে বাতাস বের করে দেয়াকে ইদ্রিস ভাই বলে ভোগলা) ছাড়ছে,' দুই হাত ছড়িয়ে ভোগলাগুলোর সাইজ দেখাল সে, তাতে মনে হলো পাঁচ-ছয় ফুটের কম না। 'বাঁ হাত দিয়ে মাদার গাছটাকে জড়িয়ে ধরে ফেললাম, জাল ছাড়লাম না। যা থাকে কপালে, ছাড়ব না। জালের দড়িটা পেঁচিয়ে ফেলতে লাগলাম একটা কাটা ডালের গোড়ায়। এই টানাটানিতে আমার লুঙ্গি খুলে পড়ে গেল (ইদ্রিস ভাইয়ের এই লুঙ্গি খুলে পড়াটা নিয়ে সবাই হাসাহাসি করে। কি ভাবে পরে কে জানে, খালি খুলে যায়), তোলার সময় নেই, চেষ্টাও করলাম না।

'হঠাৎ চোখ পড়ল মাঝ পুকুরে। ধড়াস করে এক লাফ মারল বুকের মধ্যে। চোখ উল্টে যে পড়ে যাইনি এটাই বেশি। আর দাঁড়ালাম না। নিচু হয়ে লুঙ্গিটা তুলে জালটাল ফেলেই দিলাম দৌড়। সোজা একেবারে বাড়িতে। ভীষণ ভয় পেয়েছি। এই দেখ, এখনও কেমন লোম খাড়া হয়ে গেছে,' হাত তুলে রোম দেখাল ইদ্রিস ভাই। অবাক কাণ্ড! সত্যিই দাঁড়িয়ে গেছে। বলল, 'বাড়িতে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে দায়ের আগায় করে অনেক লবণ খেলাম। লাভ হলো না কিছু। ভয় যা পাওয়ার তো পেয়েই গেছি। লবণে আর কিছু করতে পারল না। পেটে চিপ মেরে একেবারে আমাশা। একমাস ভুগেছি তার পর। রক্ত

আমাশা।

'ভোরবেলা আব্বা ওঠার আগেই উঠে আবার চলে গেলাম দুলালদের পুকুরে। আজান হয়ে গেছে। ভূত-টূত আর বেরোবে না। জালটা এনে না রাখলে কার কাজ ঠিক বুঝে যাবে আব্বা। ধোলাই আছে কপালে। সে জন্যেই গেলাম। গিয়ে দেখি আগের মতই গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে জালটা। ধরে টান দিলাম। জোর লাগল না, উঠে চলে এল। এল তো, কিন্তু ওই জাল আর ব্যবহারের উপযুক্ত নাই। ছিঁড়ে ফালাফালা। ওটাই এনে চুপে চুপে রেখে দিলাম আগের জায়গায়।'

চুপ হয়ে গেল ইদ্রিস ভাই। আমি তখন মহা উত্তেজিত। মাঝ পুকুরে কি দেখেছিল সে? জিজ্ঞেস করলাম সে কথা।

আমার কথা যেন শুনতেই পেল না ইদ্রিস ভাই। চুপচাপ বিড়ি টেনে চলেছে।

'কি দেখেছিলেন?' আবার জিজ্ঞেস করলাম।

'আরে বলছি, দাঁড়া না, বিড়িটা খেয়ে নিই।'

গল্পের একটা বিশেষ জায়গায় এনে ঝুলিয়ে রাখা তার স্বভাব। মজা পায়।

জোরে জোরে কয়েকটা সুখটান দিয়ে জ্বলন্ত গোড়াটা পানিতে ছুঁড়ে মারল ইদ্রিস ভাই। ছ্যাঁৎ করে নিভল আগুন। আমার দিকে তাকিয়ে আচমকা একটা প্রশ্ন করে বসল, 'আমার গল্প শুনতে তোর ভাল লাগে, না রে?'

'লাগে!'

'আমাকেও লাগে?'

'লাগে,' এত স্বাধীন আর এত সুন্দর গল্প যে বলতে পারে তাকে ভাল কেন লাগবে না, এটা বোঝার মত বুদ্ধি তখনও হয়নি। 'ও ইদ্রিস ভাই, বলেন না, কি দেখেছিলেন?'

হাসল সে। তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'নীল আলো!'

ঠিক এই কথাটাই শোনার আশা করছিলাম আমি।

ইদ্রিস ভাইয়ের গল্পের কথা পরে বলেছিলাম আম্মাকে। শুনে বলল, 'ওর কথা শুনতে যাস কেন? একটা মিথ্যুক।'

আম্মার বলার ভঙ্গিটা ভাল লাগল না আমার। তর্ক শুরু করলাম, 'কিন্তু আমাকে ছেঁড়া জালটা দেখিয়েছে তো। কি করে ছিঁড়ল?'

'জাল ছেঁড়ার জিনিসের কি অভাব আছে নাকি পানির নিচে? গাছটাছ কেটে ফেলে রেখেছিল হয়তো...'

'ওখানে গাছ থাকলে ইদ্রিস ভাই খুব ভাল করেই জানত।'

'হয়তো জানত। তোকে বলেনি।'

'তাহলে বলার সময় হাতের রোম দাঁড়াল কেন?'

রেগে গেল আম্মা, 'তোকে না কতবার মানা করেছি ইদ্রিসের সঙ্গে কথা বলবি না? যাস কেন?'

বুঝলাম, এবার মানে মানে সরে যাওয়াই ভাল। নইলে উটকো সব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে, যেগুলোর জবাব দিতে গেলে বিপদে পড়ে যাব। তাড়াতাড়ি সরে গেলাম।

যাই হোক, সেদিন সকালে ইদ্রিস ভাইকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'যাচ্ছেন

কোথাও?'

'হ্যাঁ। যাবি?'

'কোথায়?'

'রেলরাস্তার ধারে।'

এই রেলরাস্তাটা আমার জন্যে এক বিরাট আকর্ষণ। আব্বার সঙ্গে দু-একবার হাঁটতে গেছি। আর কারও সঙ্গে যাইনি, একা যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললাম, 'না, আম্মা শুনলে বকবে।'

'খালাম্মা শুনবে কি করে? আমি তো আর বলব না।'

'যদি কেউ দেখে ফেলে?'

'আরে দূর, কে আসছে দেখতে। আয়।'

লোভটা সামলাতে পারলাম না কিছুতেই।

আমার একটা হাত ধরে নিয়ে চলল ইদ্রিস ভাই। কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। এত দূরে যাচ্ছি! যদি কেউ দেখে গিয়ে আম্মাকে বলে দেয় তাহলে আস্ত রাখবে না। তাছাড়া এক ধরনের অপরাধ বোধ চেপেই রইল মনে। সারাক্ষণ মনে হতে লাগল আম্মাকে না জানিয়ে নিষিদ্ধ এলাকায় চলেছি। কাজটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু পিছিয়ে আসতেও ইচ্ছে করছে না।

রাস্তাটা খুব সুন্দর। অনেক গাছপালা, পাখি, ফড়িঙ, প্রজাপতি আছে। কিন্তু পুরোপুরি মন দিতে পারছি না সে সবের দিকে। আসলে অপরাধী মন নিয়ে আনন্দ পাওয়ার জন্যে কোন কাজ করা উচিত নয়, আনন্দ তো লাগেই না তখন, বরং সব কিছু মাটি হয়।

রেলরাস্তার পাশেই একটা চায়ের দোকান ছিল। সেখানে এসে থামল ইদ্রিস ভাই। বলল, 'আয় চা খাই।'

বললাম, 'আমি চা খাই না।'

'তাহলে বিস্কুট খা।'

'না খাব না।'

'আরে খা,' বলতে বলতে নিজেই টিন থেকে বড় বড় গোল দুটো সাদা বিস্কুট বের করে আমার হাতে গুঁজে দিল।

ইদ্রিস ভাই ভেতরে বসে চা খাচ্ছে, আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম চারপাশটা। প্রায় মাইল দুই দূরে রেলের একটা পুল আছে। তার ওপারে দেখা যাচ্ছে একটা ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনের অংশ। চিটাগাঙের দিক থেকে মালগাড়ি আসছে।

দোকানটার অন্য পাশে টেলিগ্রাফের তারে বসে আছে অনেকগুলো মুনিয়া পাখি। ওগুলোর মাঝে মাঝে দু-চারটা চড়াই আর শালিক। মহা কিচিরমিচির জুড়েছে।

দোকানের সামনের সরু কাঁচা রাস্তাটার পর থেকেই শুরু হয়েছে ধানের খেত। ধানকাটা সারা, আবার চষার অপেক্ষায় পড়ে আছে জমিগুলো। কয়েকটা জমি পরে একটা উঁচুমত জায়গায় কে যেন একটা মরা গরু ফেলে গেছে। শকুনে টেনে ছিঁড়ে খাচ্ছে ওটাকে।

শকুনের গরু খাওয়া আমার কোনদিনই ভাল লাগে না। ভয়াবহ, নিষ্ঠুর মনে হয় দৃশ্যটা। রক্তাক্ত একটা দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে কতগুলো কুৎসিত পাখির ঠোঁটের আঘাতে, কেমন নারকীয় ব্যাপার মনে হয়। এখনই এমন লাগে, ছোটবেলায় আরও খারাপ লাগত। আর সেদিন তো এই দৃশ্য প্রথম দেখলাম।

আম্মাকে না বলে বাসা থেকে বহুদূরে চলে এসেছি—হোক না সেটা মাত্র আধ মাইলের কিছু বেশি—এমনিতেই ভারি হয়ে আছে মন, তার ওপর ওই সাংঘাতিক দৃশ্য! ভয় করতে লাগল। নিজেকে গরুটার জায়গায় কল্পনা করতে থাকলাম। আম্মার জন্যে মন কেমন করে উঠল। ভীষণ কান্না পেতে লাগল। মনে হলো, ওই শকুনের আক্রমণ থেকে পৃথিবীতে একমাত্র আম্মাই আমাকে বাঁচাতে পারে। আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করল না ওখানে। দোকানের দরজার কাছে এসে প্রায় ককিয়ে উঠলাম, 'ইদ্রিস ভাই, বাসায় যাব!'

অবাক হয়ে বলল সে, 'সে কি রে, এইমাত্র তো এলি!'

'না, আমি চলে যাব!'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি বুঝল ইদ্রিস ভাই কে জানে, আর কিছু বলল না। দুই ঢোকে কাপের চাটুকু শেষ করে ঠকাস করে পিরিচে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। 'দামটা লিখে রাখো' দোকানদারকে বলে, সে কি বলল না বলল তার তোয়াক্কা না করেই বেরিয়ে এল। আমাকে বলল, 'চল।' তারপর লাইনের দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, মরল তো!' বলেই দিল দৌড়।

লাইনের ওপর বসে খেলা করছে একটা তিন-চার বছরের বাচ্চা। ওর মা ভিক্ষে করে। লাইনের ধারে নিচু জায়গায় নেমে শাক তুলছে। খেয়ালই করেনি তার ছেলেটা লাইনের ওপর চলে গেছে। ট্রেনও চলে এসেছে। উঠে গিয়ে যে ছেলেকে বাঁচাবে, তারও আর সময় নেই। দিশেহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল আতঙ্কিত মা।

ঘনঘন হুইসেল দিচ্ছে ট্রেন। ড্রাইভারও দেখতে পেয়েছে বাচ্চাটাকে। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। তাই বাঁশি বাজিয়ে ছেলেটাকে সরানোর চেষ্টা করছে।

ভয় পেয়ে গেছে বাচ্চাটা। সরছে না, বরং একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে জোরে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছে।

ঝড়ের গতিতে ছুটে যাচ্ছে তখন ইদ্রিস ভাই। লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল লাইনের ওপর। ছেলেটাকে জাপটে ধরে প্রায় ডাইভ দিয়ে সরে চলে গেল ওপাশে। ঠিক ওই মুহূর্তে তার পাশ কাটাল ইঞ্জিনের সামনের চাকা। হয় খুলে গিয়েছিল, কিংবা চাকায় আটকে গিয়ে টান লেগে খুলে এসেছিল ইদ্রিস ভাইয়ের লুঙ্গিটা। চাকার তলায় পিষে, কেটে সেটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ভাগ্যিস লুঙ্গির নিচে হাফপ্যান্ট পরা ছিল।

লাইনে আর পাথরে লেগে ইদ্রিস ভাইয়ের অনেক জায়গায় কেটেছড়ে গেছে। রক্ত বেরোচ্ছে। লাইনের পাশ থেকে তোলা কি এক জাতের গাছের কষ সেগুলোতে লাগিয়ে দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা সাঙ্গ করল সে। তারপর আমাকে বলল, 'চল, বাড়ি যাই।'

সেদিন থেকে আমার হিরো হয়ে গেল ইদ্রিস ভাই।

একটা ঘোরের মধ্যে যেন বাসায় ফিরে এলাম।

বাসায় ফিরে আম্মাকে বললাম সব কথা।

না বলে ওরকম একটা জায়গায় গিয়েছিলাম বলে বকতে লাগল আমাকে আম্মা। চুপ করে রইলাম। শেষে বলল, 'ইদ্রিসের সঙ্গে ওখানে যে গেলি, গাড়ির নিচেও তো পড়তে পারতি। ওই ছেলেটা না হয়ে তুইও থাকতে পারতি ওখানে। তখন কি হত?'

অবাক হয়ে বললাম, 'কি আর হত? আমাকেও বাঁচাত ইদ্রিস ভাই!'

রসগোল্লা, ইনজেকশন এবং...হি হি!

প্রাইমারি পাস করেছি ফেনী প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে। ভীষণ গরমের সময় কিছু দিনের জন্যে সকালে ক্লাসের ব্যবস্থা হত। আরও একটা ব্যাপার নিয়মের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল; রোজা, কোরবানি ঈদ, দুর্গাপূজা, কিংবা গরমের ছুটির মত বড় বড় ছুটি ঘোষণার দিনগুলোতে মর্নিং স্কুল হতই। সেই দিনটি থেকেই আমাদের আনন্দ শুরু।

স্কুলটার একটা বিশেষত্ব, ওখানে প্রাইমারি টিচারদের ট্রেনিং দেয়া হত। নানা জায়গা থেকে শিক্ষকতার পাঠ নিতে আসত ছাত্ররা। তাদের পাঠের একটা অঙ্গ ছিল আমাদের পড়ানো। স্কুলের নিয়মিত শিক্ষকরা ছিলেন, তাঁরাই সব সময় পড়াতেন, কেবল বছরের একটা বিশেষ সময়ে পড়ানোর কাজটা দেয়া হত জুনিয়র স্যারদের। এটা তাঁদের পরীক্ষা। দেখা হত শেখানোর ব্যাপারে কতটা দক্ষ হয়েছেন তাঁরা। তাঁরা যে সব উপকরণ হাতে নিয়ে পড়াতে আসতেন, পরবর্তী জীবনে শিক্ষকতা করতে গিয়ে সে সব আর কখনও ক্লাসে নিয়ে যেতেন কিনা সন্দেহ। কোন সিনিয়র শিক্ষককেই তো ওই জিনিস আনতে দেখতাম না কখনও। তাঁরাও নিশ্চয় কোন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকেই পাস করে এসেছেন।

নানা রকম মডেল বানিয়ে, ছবি কিংবা ম্যাপ এঁকে নিয়ে আসতেন জুনিয়র স্যারেরা। যে বিষয়ই পড়াতে আসুন না কেন, একটা না একটা কিছু হাতে করে নিয়ে আসা চাইই। কি জানি, নিশ্চয় ওগুলো ছিল তাঁদের পরীক্ষার অঙ্গ। মজার ব্যাপার হলো, ট্রেনিং শেষে চলে যাওয়ার সময় যদি ওসব জিনিস চাইতাম কারও কাছে, নির্দ্বিধায় দিয়ে দিতেন। তার মানে ওগুলো আর কোন কাজে লাগত না তাঁদের। জুনিয়র স্যারদের অনেকের সঙ্গেই আমার খাতির হয়ে যেত চট করে। কলা খেতে দিতেন আমাকে, রুটি-মাখন খেতে দিতেন। গল্পের বইয়ের প্রতি বেজায় লোভ ছিল আমার। তাঁদের কাছ থেকে চেয়ে নিতাম পড়ার জন্যে। রঙ তুলি দিয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতেন তাঁরা। মাটি, হার্ডবোর্ড, রঙিন কাগজ এবং আরও নানা উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন জিনিসের মডেল বানানোর সময় তাঁদের কাছে কাছে ঘুরঘুর করতাম আমি, তাঁদের কাজ দেখতে ভাল লাগত। এটা ওটা এগিয়ে দিতাম। মনে হত আমিও ওসব তৈরি করি। বাসায় গিয়ে চেষ্টাও করতাম।

যাই হোক, যা বলতে বসেছি সেটা বলি। তখন গরমের সময়। মর্নিং স্কুল চলছে। রোজ ভোরে উঠে স্কুলে যেতে হয়। সাড়ে দশটা-এগারোটা নাগাদ ছুটি। তার পরের পুরো দিনটা ফাঁকা, আমার জন্যে মস্ত সুবিধে। সারাটা দিন হেসে খেলে মহা আরামে কাটানো যায়। তাই প্রতি বছরই অপেক্ষা করে থাকতাম কখন গরমকাল আসে।

সেদিনও স্কুলে গেলাম। গিয়ে শুনি কার জানি কি একটা শুভ সংবাদ আছে, সকল শিক্ষক-ছাত্রকে মিষ্টি খাওয়ানো হবে। রসগোল্লা। হা-পিত্যেস করে বসে রইলাম কখন আসবে মিষ্টি। সব ছেলেরই আমার মত অবস্থা। পড়ালেখা আর মাথায় ঢোকে না।

সময় যেন আর পেরোতে চায় না। প্রথম চারটে ঘন্টা পড়ল। দ্বিতীয় ঘন্টারও অর্ধেক কেটে গেল। এই সময় বাইরে থুথু ফেলতে গিয়ে একটা ছেলে দেখল বিরাট বিরাট গামলা নিয়ে দপ্তরী আসছে। ছুটে ক্লাসে ঢুকে খবরটা জানিয়ে দিল সে। আর কি ঠেকানো যায়। শুরু হলো প্রচণ্ড হট্টগোল। টেবিল চাপড়ানো, জোরে-জোরে কথা আর হুল্লোড় শুরু হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও আমাদেরকে থামাতে না পেরে শেষে রেগে গিয়ে স্যার বললেন, 'তোরা কি কখনও মিষ্টিও খাসনি!'

ছেলেটা দেখে এসেছে অনেকক্ষণ হয়ে গেল। তার পরেও মিষ্টি আর আসে না। অপেক্ষাটা আরও অসহনীয় হয়ে উঠল। আসে না কেন? আমাদের পাশের ঘরটাতেও হইচই হচ্ছে। ওটার সামনে দিয়েই আসতে হবে দপ্তরীকে।

শেষে আর থাকতে না পেরে একটা ছেলে স্যারকে জিজ্ঞেস না করেই বেরিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এল। জানাল, পাশের ঘরেই মিষ্টি বিতরণ হচ্ছে। দুটো ঘর শেষ করে আসতে আসতে অনেক সময় লেগে গেল তিনজন দপ্তরীর। অবশেষে শেষ হলো প্রতীক্ষা। ঘরে ঢুকল মিষ্টির গামলা। তুমুল করতালি আর টেবিল চাপড়ানোর মধ্যে দিয়ে মিষ্টিকে স্বাগত জানালাম আমরা।

কিন্তু গামলা তো নিয়ে এল, দেবে কিসে করে? পিরিচ তো নেই। তার মানে হাতে হাতেই দেবে। দিক। খেয়ে নিয়ে গিয়ে হাত ধুয়ে আসব। তবে সেটাও যাতে করা না লাগে তার উপায় বাতলে দিল দপ্তরী। আমাদেরকে বলল, যার যার খাতা থেকে একটা করে পাতা ছিঁড়ে নিতে। তাতেই দেয়া হবে।

ফড়াত ফড়াত পাতা ছেঁড়ার শব্দ হতে লাগল। আমাদের কাণ্ড দেখে স্তব্ধ হয়ে গেছেন স্যার। অসহায় ভঙ্গিতে নির্বাক বসে আছেন গালে হাত দিয়ে।

আমি পাতা ছিঁড়লাম না। কিসের আবার ছিঁড়াছিঁড়ি, হাতে নিয়েই খেয়ে ফেলব। আম্মা তো আর নেই যে হাত ময়লা কিনা দেখতে আসবে।

শুরু হলো মিষ্টি বিতরণ। সাথে করে একটা পিরিচ আর ছুরি নিয়ে এসেছে দপ্তরী। পিরিচে একটা করে রসগোল্লা তুলে রাখে, ছুরি দিয়ে কেটে দুই ভাগ করে, তারপর অর্ধেকটা করে রসগোল্লা আলগোছে তুলে নিয়ে এনে ফেলে দেয় ছেলেদের বাড়িয়ে দেয়া হাতের তালুতে রাখা কাগজে।

পয়লা মিষ্টিটা কাটতে দেখেই দমে গিয়েছিলাম আমি। বিতরণ শুরু হতে ছেলেরাও বোকা হয়ে গেল। এই তাহলে মিষ্টি খাওয়া! এরই জন্যে এত উত্তেজনা!

মেজাজই খারাপ হয়ে গেল আমার। আমাকে যখন দিতে এল, সাফ মানা করে দিলাম, 'খাব না!'

বোধহয় আমার মনের ভাব বুঝতে পারল দপ্তরী। বলল, 'এত মানুষ। বেশি করে তো আর দেয়া যায় না।'

'তাহলে খাওয়ানোর দরকারটা ছিল কি? পায়ে ধরতে গিয়েছিলাম নাকি খাওয়ানোর জন্যে?'

জবাব দিতে পারল না দপ্তরী। সরে গেল পাশের ছেলেটার কাছে।

তবে ষোলকলা পূর্ণ হতে আরও বাকি ছিল সেদিন।

মিষ্টি খাওয়ার হইচই তো শেষ হলো। আরেক ঘন্টা পড়ল। এই সময় পাশের ঘরে আবার শুরু হলো হট্টগোল। কি ব্যাপার? একটা ছেলে বলল, 'আবার মিষ্টি নাকি?'

আরেকজন বলল, 'হতে পারে। তখন কম হয়ে গিয়েছিল বলে আবার এনেছে হয়তো!'

পরক্ষণেই বিকট এক চিৎকার। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে একটা ছেলে। যেন জবাই করার জন্যে চেপে ধরে শোয়ানো হয়েছে তাকে। পড়াতে পড়াতে থমকে গেলেন স্যার। যে ছেলেটা আগের বার মিষ্টি কতদূর এল দেখতে বেরিয়েছিল সে-ই পেছনের দরজা দিয়ে চট করে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই এসে ঢুকল। চোখমুখ ফ্যাকাসে। ভীষণ ভয় পেয়েছে। ওর নাম কাশেম।

'কি হলো রে?' জিজ্ঞেস করলাম। পেছনের বেঞ্চে বসতাম আমি, স্যারের চোখ এড়িয়ে দুষ্টুমি করার সুবিধে বলে। সেদিনও বসেছিলাম।

'ইনজেকশন!' কেঁদে ফেলবে যেন কাশেম।

'ইনজেকশন? বলিস কি?' আঁতকে উঠল আমার পাশের ছেলেটা।

'হ্যাঁ। কলেরার!'

'আরে ধুর! কলেরার আবার ইনজেকশন হয় নাকি?'

'তাহলে অন্য কিছুর! মোট কথা ইনজেকশন!'

কলেরা-বসন্ত মহামারী আকারে দেখা দিত তখন। তাই বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে স্কুলে স্কুলে ঘুরে টিকা আর ইনজেকশন দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করত রেডক্রস কিংবা বিদেশী অন্য কোন মেডিক্যাল টিম। আমার মত আরও অনেক ছেলের জন্যে সেটা ছিল একটা আতঙ্ক।

পড়ালেখার বারোটা বাজল আবার। স্যারের কোন কথাই আর কারও কানে ঢুকল না। সবাই অন্যমনস্ক, অস্থির। আবার প্রতীক্ষার পালা। তখন করেছি মিষ্টির, এখন ইনজেকশনের। তবে প্রথমটা আসতে যতটা দেরি হচ্ছে মনে হয়েছিল, পরেরটার আগমন মনে হলো ততটাই তাড়াতাড়ি।

ব্যাগ হাতে এসে হাজির হলো বাঘ। সঙ্গে তার কয়েক চ্যালা। রূপকথার গল্পে পড়েছি বাঘের চ্যালা হয় সাধারণত শেয়ালেরা। কাজেই ওই লোকগুলোকে শেয়াল বললে ভুল হবে না। অবশ্য একজনের মুখের সঙ্গে শেয়ালের চেহারার অনেকটা সাদৃশ্য

ছিল। ওই লোকটাকে দেখেই অপছন্দ করলাম।

ভারিক্কি চালে ব্যাগ থেকে সিরিঞ্জ আর ওষুধপত্র বের করল বাঘ। ওষুধ ভরল সিরিঞ্জে। ভুরু কুঁচকে সারা ক্লাসে নজর বুলিয়ে আনল একবার। যেন ভয়ে কম্পিত ছাগলছানাদের কোনটার ঘাড় আগে মটকাবে জরিপ করছে।

প্রথম বেঞ্চের প্রথম ছেলেটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। গাঁইগুঁই করতে লাগল ছেলেটা। কানই দিল না বাঘ। চামড়ায় সুচ ঠেকতেই আঁউ করে উঠল ছেলেটা। তারপর ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

দুই নম্বর ছেলেটার নাম আলতাফ। তাকে ধরতে যেতেই ঢুকে গেল বেঞ্চের তলায়।

এই সময় এক কাণ্ড করে বসল কাশেম। ইনজেকশনের দল ঢুকতেই সমস্ত দরজা আটকে দেয়া হয়েছিল, যাতে কেউ বেরোতে না পারে। পেছন দিকের একটা পাল্লার কাচের শার্সির একটা জায়গায় ভাঙা। সেই ফোকরে মাথা গলিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল সে। ধরো ধরো রব উঠল। ধরে ফেলা হলো কাশেমকে।

আমার বুকের মধ্যে কাঁপছে। আগে কখনও ইনজেকশন দিইনি। কি রকম ব্যথা, জানি না। স্যার আমাদের অবস্থা দেখে বারবার অভয় দিচ্ছেন, 'কিছু না, কিছু না, পিঁপড়ের কামড়। টেরই পাবে না।'

এবং সেটা বোঝানোর জন্যে নিজেই শার্টের হাতা গুটিয়ে এগিয়ে এলেন ইনজেকশন নেয়ার জন্যে। সুচ ফোটানোর আগে হাসি হাসি ভাব করে তাকিয়ে রইলেন ওটার দিকে। কিন্তু সুচ ফোটানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চেহারা বিকৃত করে ফেলার ভঙ্গি দেখেই আন্দাজ করে ফেললাম, *পিঁপড়ের কামড়টা* বড় শক্ত কামড়।

ভয়টা আরও বেড়ে গেল আমার। মরিয়া হয়ে উঠলাম। কি করা যায়? ইনজেকশন আমি নিতে পারব না। পালাতে হবে। যে করেই হোক।

আমি বসেছি জানালার কাছে। ওখানেই বেশিরভাগ সময় বসি। কারণ তাহলে বাইরেটা দেখা যায়। কয়েকটা আম গাছ আছে ওদিকটায়। তাতে ঘুঘু এসে বসে। আরও নানা রকম পাখি। ক্লাস করতে করতে মাঝে মাঝেই সেদিকে তাকিয়ে থাকি। নিরস পাঠের মধ্যে সেটা যেন এক বিরাট স্বস্তি। জানালাটার শিক নেই। অনেক বড়, আর অনেকটা উঁচুতে। ওটা ডিঙাতে হলে বেঞ্চের ওপর উঠতে হবে। কয়েকটা ঝুঁকি নিতে হবে তাতে। স্যার দেখে ফেলতে পারেন। দপ্তরী ছুটে আসতে পারে। আমার পাশের ছেলেটা পা ধরে আটকানোর চেষ্টা করতে পারে। শেয়ালগুলোকে ভয় নেই, ওরা ব্যস্ত। তবে সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার যেটা, তা হলো ওখান থেকে নিচে লাফিয়ে নামা। ওখানটায় কাঁটা ঝোপে ভরা। জংলা। জানালার ঠিক নিচে রয়েছে একটা চওড়া ড্রেন। অনেক ঝুঁকির ব্যাপার, তা-ও ইনজেকশনের চেয়ে ভাল মনে হলো। আরেকটা ছেলেকে চেপে ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। কারণ ওই সময়টায় সবার চোখই ওদিকটায় থাকে। যেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল বাঘ-শেয়ালেরা, বেঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়ালাম। এক লাফে জানালায় উঠে যা থাকে কপালে ভেবে দিলাম লাফ। এক লাফে নর্দমা ডিঙিয়ে পড়লাম ওপাশে। কাঁটার আঁচড় লাগল দু-এক জায়গায়, কেয়ারই করলাম না। পেছনে হইচই

করে উঠল কয়েকজন। ফিরেও তাকালাম না। ঝেড়ে দিলাম দৌড়। আম বাগানের ভেতরে ঢুকে ওপাশে বেরিয়ে একটা মজা পুকুরের পাড় দিয়ে ছুটলাম। নিশ্চিন্ত হলাম এতক্ষণে। আর আমাকে ধরতে পারবে না। বইখাতা সব ক্লাসেই ফেলে এসেছি। জানি, হারাবে না। দপ্তরী নিয়ে গিয়ে অফিস ঘরে রেখে দেবে। পরদিন গিয়ে নিয়ে নিতে পারব।

একটা শর্টকাট রাস্তা দিয়ে বাসার পথ ধরলাম। গনু হাজারির বাড়ির ভেতর দিয়ে এসে সোনা হাজারির বাইরের উঠান পেরিয়ে আমাদের উঠান। চুপে চুপে ঢুকে দেখি, রান্নাঘরের পাশে বসে আছে সামসু। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'এই ধ্যান্দা, আম্মা কোথায় রে?' সকাল সকাল স্কুল থেকে ফিরেছি দেখলেই কৈফিয়ত দিতে হবে।

দা দিয়ে তামাক পাতা কাটছে সামসু। জানাল, আম্মা গেছে পাশের ডলিদের বাড়িতে। গুড। নিশ্চিন্ত। বসে পড়লাম সামসুর কাছে।

বাজারের বিড়ি খেয়ে পোষায় না সামসুর। দাম বেশি। তাই তামাক পাতা কিনে আনে। সেগুলো কুচি কুচি করে কেটে রোদে শুকাতে দেয়। কাগজে ভরে বিড়ি বানিয়ে টানে। সে বলে, 'বাজারের বিড়িট্‌ঠেকে ইটা বালো।' (বাজারের বিড়ি থেকে এটা ভাল)

বিড়ির গল্প বলার আগে সামসুর পরিচয়টা দিয়েই নিই, কারণ ও আমার কাছে একটা বিশেষ চরিত্র। ভাল নাম সামসুল হক, ডাক নাম সামসু। কিন্তু আম্মা আর আব্বা ছাড়া আর কেউ ওকে ওই নামে ডাকে না, বলে সামছা। আমি তা-ও ডাকতাম না, ডাকতাম ধ্যান্দা। এটা একটা আঞ্চলিক বিকৃত শব্দ। যে কানে শোনে না, অর্থাৎ কালা, তাকে বলে ধ্যান্দা। আমাদের সামসু পুরোপুরি কালা নয়, তবে অনেকটাই কম শোনে। হ্যাঁ, এখনও বেঁচে আছে সামসু, তবে অবস্থা তার বড়ই করুণ। একটা হাত নষ্ট হয়ে গেছে। বাসের জানালার ধারে রেখেছিল হাতটা, আরেক বাসে গুঁতো মেরে দিয়েছে শেষ করে। কেমন যেন অ্যাক্সিডেন্টের রাশি ওর, খালি অ্যাক্সিডেন্ট করে। আরেকবার ট্রেনের তলায়ই চলে গিয়েছিল আরেকটু হলে, অল্পের জন্যে বেঁচেছে। সে আরেক গল্প।

আমার চেয়ে সাত-আট কিংবা দশ বছরের বড় হবে ও। ঠিক জানি না। সে আন্দাজে যা বলে, আমিও সেটাই জানি। ও কি করে ঢুকল আমাদের পরিবারে, বলি।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রান্নাঘরে গিয়ে দেখি একটা ছেলে আম্মার পাশে বসে মশলা পিষছে। আম্মা তখন চুলার কাছে। অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম ছেলেটার দিকে। মাথায় অল্প কয়েকটা রোম কেবল, চুল বলা যাবে না ওগুলোকে (এখন অবশ্য আর রোমও নেই, একেবারে খালি, চকচকে টাক), চোখের পাপড়ি নেই, ভুরু নেই, সারা শরীরের কোথাও একটা রোম নেই (বড় হওয়ার পর দাড়ি-গোঁফও গজায়নি)। কিচ্ছু না। আমাকে দেখেই মশলা পেষা থামিয়ে আম্মাকে জিজ্ঞেস করল, 'আম্মা, ডাডা (দাদা) নাকি?' বাড়ি ওর নোয়াখালি, কিন্তু পুরোপুরি ওখানকার ভাষায় কথা না বলে কিছুটা শুদ্ধ করে বলতে চায়, সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে উচ্চারণ বিকৃতি আর অস্পষ্টতা, ফলে হাস্যকর শোনায়।

মাথা ঝাঁকিয়ে আম্মা বলল, 'হ্যাঁ।'

দাঁত বের করে বিচিত্র এক হাসি আমাকে উপহার দিল সামসু। অদ্ভুত একটা কাশির মত শব্দ দিয়ে হাসি শেষ করে সে। গলার অনেক গভীর থেকে যেন বেরিয়ে আসে কফ-

জড়ানো সেই শব্দ।

আমি তাকিয়েই রয়েছি।

আমার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে বলল সে, 'সুল নাই যে সেটা ডেইক্‌টেসটো? টাইপিড হইসিল।' অর্থাৎ চুল নেই যে সেটা দেখছ তো? টাইফয়েড হয়েছিল।

সামসু মিয়ার অবস্থাটা বড়ই দুঃখজনক, কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ওই বয়সে দুঃখ পাওয়ার বদলে আমার পেল হাসি। একে তো ওই চুলহীন-মাথা, তার ওপর ভাষা এবং উচ্চারণ শুনে হা-হা করে হেসে উঠলাম। কিছুই মনে করল না সামসু। নিজেও হেহ্ হেহ্ করে হাসল। নিষ্পাপ সুন্দর হাসি। চুলটুল থাকলে চেহারাটা খারাপ লাগত না, কিন্তু টাইফয়েড সর্বনাশ করে দিয়েছে বেচারার। কানেরও বারোটা বাজিয়েছে।

আম্মার কাছে জানলাম, রাতে আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন ওর বাবা ওকে নিয়ে এসেছে। ওর বাবা আব্বার অফিসে পিয়ন ছিল। সামসু তার বড় ছেলে। আরও অনেক ছেলেমেয়ে আছে, তবে সবাই সামসুর সৎ ভাই-বোন। বিমাতার অত্যাচার সইতে না পেরেই ঘর ছেড়েছে মাতৃহীন সামসু। কিংবা বলা যায় সামসু এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর অত্যাচার সইতে না পেরেই বড় ছেলেকে ঘর ছাড়া করে হাঁপ ছেড়েছে তার বাবা। বাড়ি থেকে বেরোতে পেরে খুশিই হয়েছে সামসু।

এসব জানার পর তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এই ধ্যান্দা, চলে এলি কেনরে?'

তার একটা দুর্লভ হাসি দিয়েছে সামসু। কথায় কথায় হাসাটা তার একটা বিরাট গুণ। মুখ গোমড়া করে থাকতে তাকে খুব কমই দেখেছি। বলল, 'বাইয়া, কি কমু, বেডিটা এক্কেবারে শয়টান, ইবলিস!' তার ভাষায় বলে গেল সেই পুরানো কাহিনী—সৎ মা হলে সাধারণত যা হয়। খেতে দেয় না, চাকরের মত খাটায়, মারধর করে, বাপের কাছে তার নামে মিথ্যে করে সাতখান লাগায়, এই সব আরকি। এরপর অনেকেই যেমন টিকতে পারে না, সামসুও পারেনি। তবে বেরোনোর আগে খানিকটা প্রতিশোধ নিয়েছে। সেই কথাটা তার নিজের ভাষায়ই বলি, 'পাকের গরে কায কইট্টেসিলাম। বেডি আসি বকাবকি শুরু কইল্ল। আগে ঠেকেই সেটি রইসি। টারপর যখন কিল মাইল্ল, আর সইয্য কইট্টে পাইল্লাম না। বড় একটা পিঁড়া টুলি গুরাই মাইল্লাম বাড়ি। মা-গো করি সিল্লান ডি বসি গেল বেডি...' (পাকের ঘরে কাজ করছিলাম। বেটি এসে বকাবকি শুরু করল। আগে থেকেই রেগে ছিলাম। তারপর যখন কিল মারল, আর সহ্য করতে পারলাম না। বড় একটা পিঁড়ি ছিল। তুলে ঘুরিয়েই কোমরে মারলাম বাড়ি। মা-গো করে চিৎকার দিয়ে বসে গেল বেটি...)

সেই প্রথম দেখার মুহূর্ত থেকেই সামসু আমার বন্ধু হয়ে গেল। পরে আম্মার হয়েছিল ডান হাত। আব্বাও তাকে খুবই পছন্দ করত। অফিস থেকে এলেই আব্বার স্যান্ডেল এগিয়ে দেয়া, হাতমুখ ধোয়ার পানি দেয়া, আর আরও অনেক টুকিটাকি কাজ করতে কখনও ভুল হত না তার। আব্বা খেয়েদেয়ে বিছানায় কাত হলে লম্বা নলওয়ালা হুকোর কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে নিয়ে হাজির হত সে। নলটা আব্বার হাতে ধরিয়ে দিয়ে হাত পাখা নিয়ে আসত। জিজ্ঞেস করত, 'সাব, বাটাস ডিমু?'

পাখাটা তার হাত থেকে নিয়ে আব্বা বলত, 'লাগবে না, যা।'

পরে আব্বাকে অফিসে বাতাস দেয়ার চাকরিই নিয়েছিল সামসু। মফস্বল শহরের অফিস-আদালতগুলোতেও তখন বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি ঠিকমতো। গরমে সাহেবদের কষ্ট হয়, কাজের অসুবিধে হয়, সে জন্যে মাইনে করা টানা-পাখা টানানোর লোক রাখা হত। সেই চাকরিই পেয়েছিল সে। বেতন মাসে পঞ্চাশ টাকা। প্রথম মাসের বেতন পেয়ে বাসায় এসেই আম্মার পায়ে ধরে সালাম করে সব টাকা তার হাতে তুলে দিয়ে সামসু বলেছিল, 'আম্মা, রাখেন। আপনের কাসেই ঠাক।'

মিটিমিটি হেসে জিজ্ঞেস করেছিল আম্মা, 'এত টাকা তুই কি করবি রে, সামসু?'

একটুও দ্বিধা না করে সামসু জবাব দিয়েছিল, 'আব্বারে ডিয়া ডিমু। টেকা নাই। সংসার সালাইটে পারে না।'

পয়সা-কড়ির কোন লোভ ছিল না সামসুর। বিলাসিতা ছিল একটাই, বিড়ি খাওয়া। চাকরি যখন করত না, তখনও খেত। আমাদের বাসায় কাজ করে পাঁচ টাকা মাইনে পেত। সব টাকা সামসুর বাবা এসে মাস শেষে নিয়ে যেত। বাজারের টাকা মারার স্বভাব ছিল না সামসুর, চুরি করত না, বিড়ি খাওয়ার টাকা পাবে কোথায়? আম্মার কাছে এসে চাইত, 'আম্মা, সাইর (চার) আনা পয়সা ডেন।'

প্রথমবার ওভাবে পয়সা চাইলে আম্মা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কি করবি?'

জবাবে হে হে করে কিশলিত হাসি।

'আরে হাসছিস কেন? কি করবি বল না?'

আবার হাসি।

পড়ার টেবিলে বসে তখন শুঁয়াপোকার রঙিন ছবি আঁকছিলাম আমি। বললাম, 'বিড়ি খাবে।'

সামসুর কাচুমাচু অবস্থা।

মুখ টিপে হেসে আম্মা বলল, 'কেন খাস ওসব ছাইপাঁশ?'

মুখ নামিয়ে সামসু বলে, 'অইভ্যাস হই গেসে, আম্মা। সাইত্তে (ছাড়তে) পারি না।'

আর কিছু না বলে আঁচল থেকে পয়সা খুলে দিয়ে চলে গেল আম্মা।

আমার কাছে এসে অভিযোগের সুরে সামসু বলল, 'ডাডা, টুমি আমাকে এই রকম বেইয্যটি কইরলে কেন?'

ধমক দিয়ে বললাম, 'দূর ধ্যান্দা, না বললে দিত নাকি? আম্মার স্বভাব জানিস না? সব কিছু জানা চাই।'

অল্প পয়সায় অনেক বেশি বার ধূমপান করার জন্যে তামাক পাতা কিনে এনে নিজেই বিড়ি বানিয়ে নিত সামসু। তার ওই বিড়িই চিরকালের জন্যে ধূমপানের মারাত্মক নেশা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাকে।

সেই কথাই বলি এবার। ইনজেকশনের ভয়ে স্কুল থেকে পালিয়ে এসে গল্প করতে লাগলাম ওর সঙ্গে, আর ওর পাতা কাটা দেখতে লাগলাম। সিগারেট খাওয়াটা নিশ্চয় ভারি মজার—একথা আগেও অনেকবার মনে হয়েছে আমার, সেদিনও হলো। কত মজা করে খায় সবাই। আব্বার তো সিগারেট না থাকলে মাথাই খারাপ হয়ে যায়। যারাই সিগারেট খায় দেখি, না পেলে অস্থির হয়ে ওঠে। আমার মনে হতে লাগল সাংঘাতিক

মজার জিনিস। না খেলে জীবনই বৃথা। নাহ্, খেয়েই দেখতে হবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। আম্মা জানলে পিটিয়ে হাড্ডি ভাঙবে। কিন্তু সে তো জানলে পরে।

কিন্তু খাব যে পাব কোথায়? আব্বার প্যাকেট থেকে চুরি করার সাহস নেই। অতবড় দুঃসাহসের কাজ করতে পারব না। দোকান থেকে কিনে খাব? সবাই আমাকে চেনে। যদি আব্বাকে বা কোন স্যারকে বলে দেয়? অনেক দূরের কোন দোকান থেকে? না, অত কষ্টই বা করতে যাব কেন? হাতের কাছেই তো রয়েছে। সামসুর তামাক পাতা। সে তো বুকে চাপড় দিয়ে বলে, আর সব বিড়ি-সিগারেটের চেয়ে ওরগুলো অনেক ভাল। ঠিক করে ফেললাম, ওগুলো থেকেই খেয়ে দেখব।

চাইলে দেবে না, একটাই পথ, চুরি করতে হবে।

তক্কে-তক্কে রইলাম। সামসু টিনটা কোথায় রাখে জানি আমি। সুযোগ পেয়ে গেলাম। দুপুরে সে পুকুরে যেতেই তার টিন খুলে একমুঠো পাতা সরিয়ে ফেললাম। তারপর সময় সুযোগ মত মোটা দেখে একটা বিড়ি বানালাম। অনেক মোটা। খাব যখন ভালমতই খাব। সরু, রোগা বিড়ি খেয়ে লাভ কি? আমার তো আর সামসুর মত খরচ বাঁচানোর ঝামেলা নেই।

বিড়ি বানানো শেষ। আরেকটা সমস্যা দেখা দিল। কোথায় বসে টানব? সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পড়তে বসতে হবে। রাতে আর সুযোগ নেই। ঠিক করলাম, পরদিন ভোরে উঠে পায়খানায় চলে যাব। দরজা লাগিয়ে দিলে একেবারে নিশ্চিন্ত। কারও চোখে পড়ার ভয় নেই।

পরদিন খুব ভোরে উঠে রান্নাঘরে ঢুকে একটা দেশলাই নিয়ে বদনা হাতে ঢুকলাম পায়খানায়। দরজা টেনে দিলাম।

হপ্তায় একবার করে পৌরসভার মেথর আসে। ভরা গামলা পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। আমি যেদিন এই কাণ্ড করলাম, সেদিন গামলা প্রায় ভরে এসেছে।

পকেট থেকে সিগারেটটা বের করলাম। বড়রা যেমন করে টেবিলে কিংবা শক্ত জায়গায় ঠুকে নেয় সিগারেটের মাথা, তেমন করে ঠুকতে লাগলাম ওটা দেয়ালের গায়ে। মনে হলো ওরকম করা দরকার, নইলে স্বাদ ভাল হবে না। ভারিক্কি চালে ঠোঁটে লাগিয়ে দাঁত দিয়ে চেপে ধরলাম। দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরালাম। তারপর কষে দিলাম টান।

বোঁ করে চক্কর দিয়ে উঠল মাথা। গলার ভেতরে অসহ্য জ্বালা। শ্বাস নিতে পারছি না। খুক্কুর-খুক করে কাশি দিলাম বোধহয় একবার। তারপর আর কিছু মনে নেই।

হুঁশ ফিরলে দেখলাম গামলা থেকে টেনে তুলছে আপা।

কয়েক ডেকচি গরম পানি আর গোটা দুই সাবান ঘষে আমাকে সাফ করল। প্রায় অর্ধেক কৌটা পাউডার মাখল শরীরে। জামা-কাপড় পরাল। শুঁকে দেখল আমার শরীর, স্কুলে যেতে পারব কিনা, নাকি দূর দূর করে তাড়াবে ছেলেরা।

জানলাম, জোরে নাকি চিৎকার করে উঠেছিলাম। আপা আর সামসু দুজনেই শুনতে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছিল কি হয়েছে দেখার জন্যে।

নারকেলের শলা দিয়ে পিঠে দুই ঘা লাগিয়ে আম্মা শাসাল, 'আর টানবি?'

জবাব দিলাম, 'জিন্দিগীতেও না!'

কাছেই দাঁড়ানো আব্বা। মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল রে?'
'আরে দূর, ওই জিনিস মানুষে খায় নাকি! জঘন্য!'
ওই আমার জীবনের প্রথম এবং শেষ ধূমপান।

ওরা কি মানুষ!

আমাদের প্রাইমারি স্কুলে অনেক রকম ফুলগাছ ছিল। ছিল প্রচুর প্রজাপতি আর ফড়িঙ। ফেনী জেলখানাটা যে পাশে ছিল, সেপাশে রাস্তার দিকের কোণে ছিল একটা ফুল গাছ, নাম মনে নেই। সরু সরু সবুজপাতা। বেশ বড় হয় গাছগুলো। তাতে হলুদ ফুল ধরে, আর চারকোণামতো শক্ত এক ধরনের ফল। ভেতরে অনেক বড় বীচি। ওসব নিয়ে খেলতাম। ফুল ছিঁড়লে গোড়া থেকে সাদা কষ বেরোত। খুব সাবধানে ছিঁড়লে আর বেরোত না, জোড়া থেকে খুলে চলে আসত। গোড়ার দিকটা তখন মুখে পুরে টান দিলেই মধু বেরিয়ে আসত। ওই মধুর লোভেই ঘুরঘুর করতাম ফুলগাছের তলায়।

ওই গাছটাকে ঘিরে অনেক স্মৃতি রয়েছে আমার।

বেশির ভাগই আনন্দের। মজার। হাসির। তবে করুণ স্মৃতিও আছে। বলি সেটা। একদিন স্কুলে গেছি। ক্লাস শুরু হয়নি তখনও। হঠাৎ দেখলাম ফুলগাছের পাশের একটা বড় গাছ থেকে নেমে আসছে একটা প্রাণী। কাঠবেরালি গোষ্ঠীরই কোন জীব হবে। তবে পেয়ারা আর নারকেল-সুপারির বংশ ধ্বংস করে যে সব সাধারণ কাঠবেরালি ওটা সেই প্রাণী ছিল না, অত ছোট নয়, অনেক বড়। আদৌ ওটা কাঠবেরালি ছিল কিনা তাই বা কে জানে। বড়রা ওই নাম বলেছে, সেটাই মনে আছে। আর কোন দিন ওরকম প্রাণী আমার চোখে পড়েনি।

গাছ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ানের চোখে পড়ে গেল ওটা। হইহই করে উঠল। তার ধারণা, স্কুলের নারকেল-সুপারির একটা বড় অংশ যায় ওই বিশেষ কাঠবেরালিটার পেটে। খায় যত নষ্ট করে তার চেয়ে বেশি।

লোকের অভাব নেই স্কুলে। জুনিয়র টিচারদের খাবার রান্না করার জন্যে অনেক বড় রান্নাঘর ছিল বোর্ডিঙের একধারে। তাতে চাকর-বাবুর্চি ছিল অনেক। দারোয়ানের চিৎকারে ছুটে এসে জীবটাকে দেখে ফেলল ওরাও। আর যায় কোথায়। রান্নাঘরের পাশের ভাঁড়ারে লাকড়ির অভাব নেই। যে যেটা পারল তুলে নিয়ে এল। ঘিরে ফেলল জীবটাকে। বড় গাছে উঠতে দেয়া হলো না কিছুতেই। আটকে ফেলল চারদিক থেকে। গাছের পাশে একটা ড্রেন আছে, বর্ষার সময় শুকনো থাকে। তাতে নেমে পড়ল প্রাণীটা। বেরোতে পারল না কোনদিক দিয়েই। শেষে আর কোন উপায় না দেখে ফুলগাছটা বেয়ে উঠতে শুরু করল। গাছের কাণ্ডটা সোজা ছিল না, ছিল হেলানো, পা দিয়ে ঢেঁকি চেপে তুললে যেমন কাত হয়ে থাকে অনেকটা তেমনি। কয়েক ফুট উঠতে না উঠতেই প্রথম

বাড়িটা পড়ল পিঠে। কাণ্ডের সঙ্গে চেপে গেল তুলতুলে শরীরটা। বাঁকা হয়ে মাথাটা উঠে গেল ওপর দিকে। প্রাণীটার চোখের আতঙ্ক এখনও যেন স্পষ্ট দেখতে পাই।

এক বাড়িতেই কাবু হয়ে গেল ওটা। তারপরেও বাঁচার প্রচণ্ড আকুতিতে গাছ বেয়ে ওঠার চেষ্টা করল। পারল না। আরেক বাড়িতে মাটিতে ফেলে দেয়া হলো। তারপর চারপাশ থেকে দমাদম আরও কয়েকটা বাড়ি। নিথর হয়ে গেল শরীরটা। কে যেন গাল দিল, 'শয়তানের বাচ্চা! আর খাবি নারকেল-সুপারি?' লেজ ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ওই শুকনো ড্রেনেই ফেলে দেয়া হলো ওটাকে।

নরম মনের মানুষ বলা যাবে না আমাকে, ওই বয়সেও ছিলাম না। যখন তখন পাখি মারতাম, ব্যাঙ মারতাম, টিকটিকি আর কাঁকড়া মারতাম, বেড়াল পেটাতাম, কুকুরকে ঢিল ছুঁড়তাম। মজা পেয়ে হাসতাম। কিন্তু সেদিন কি হলো কে জানে। ওই প্রাণীটাকে মরতে দেখে হাহাকার করে উঠল বুকের ভেতর। চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল। লজ্জায় পারলাম না। তবে স্কুলের পেছনে গিয়ে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছি। ওই প্রাণীটার ওপর কেন যে এত মায়া হয়েছিল আমার, বলতে পারব না। একটা কারণ হতে পারে, অসহায় একটা সুন্দর জীবকে নিষ্ঠুরের মত পিটিয়ে মারল একদল মানুষ, সেই দৃশ্যটাই বোধহয় সহ্য করতে পারিনি।

তারপর প্রতিদিন স্কুলে গিয়ে ক্লাসে বইখাতাগুলো রেখেই আগে দেখতে যেতাম জীবটার কি হলো। রাতে ভাবতাম, কোন অলৌকিক কারণে বেঁচেও উঠতে পারে ওটা, গিয়ে দেখব জ্যান্ত হয়ে বসে আছে গাছের ডালে। কিন্তু তা আর হত না। পরদিন গিয়ে দেখতাম আগের জায়গাতেই রয়েছে ওটা। আরেকটু ফুলেছে শরীর। একদিন দেখলাম পোকা কিলবিল করছে পচে যাওয়া শরীরে। ডিম পেড়ে রেখে গেছে মাছি, শুঁয়াপোকা বেরিয়েছে। খেয়ে শেষ করতে আর দেরি নেই। ভয়াবহ দুর্গন্ধ।

যতটা তাড়াতাড়ি শেষ হবে ভেবেছিলাম, ততটা তাড়াতাড়ি হলো না। কিংবা বেশি আগ্রহ ছিল বলেই আমার মনে হতে লাগল দেরি হচ্ছে। তবে শেষ হলো একদিন। মাটিতে মিশে গেল শরীরটা। তার পরেও অনেক দিন মাটিতে যেখানটাতে পচেছে সেখানে একটা দাগ থেকেই গেল। ওই সময় ভীষণ ভয় লাগত আমার। মনে হত, আমিও একদিন ওরকম করে শেষ হয়ে যাব। কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কান্না পেত তখন। ওই ফুল গাছ, স্কুল, ওই শহর, পরিচিত জন, সব ছেড়ে যেতে হবে ভাবলেই আর কিছু ভাল লাগত না। মন খারাপ করে বাসায় ফিরলাম একদিন। আম্মা জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে? বললাম সব। ভয় পেয়ে গেল আম্মা। প্রথমে ধমক লাগাল আমাকে, 'যাস কেন ওসব দেখতে!' তারপর বোঝাতে লাগল।

মৃত্যুর কথাটা ভুলে গেলাম তাড়াতাড়িই। তবে মানুষের নিষ্ঠুরতার কথা ভুলতে পারলাম না। ওই কাঠবেরালিটার কথা ভাবলেই আরেকটা প্রায় একই ধরনের ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। একই নিষ্ঠুরতা। বিকেল বেলা একদিন স্কুল থেকে ফিরছি ঘুরপথে। দেখি একটা দোকানের সামনের বারান্দায় খুঁটিতে জানোয়ারের মত বেঁধে রাখা হয়েছে একটা লোককে। বাঁধাও হয়েছে বেশ কায়দা করে। খুঁটিটাকে ভেতরের দিকে রেখে হাত দুটো এনে এক কব্জির সঙ্গে আরেক কব্জি বেঁধেছে। দাঁড়িয়েই থাকতে হবে তাকে, বসার

উপায় নেই। লোকটার অপরাধ সে চোর। কি চুরি করেছে জানলাম, পুরানো একটা বিছানার চাদর, আর কিছু পুরানো কাপড়। ক'টাকা আর বিক্রি হবে! ক্ষুধার জ্বালায় চুরি করেছে। এবং আনাড়ি বলে শুরুতেই ধরা পড়ে গেছে। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে অত্যাচার। খালি গায়ে মারের অনেক দাগ দেখলাম।

কয়েকজন লোক জটলা করছে ওখানে। সবাই পিটিয়েছে ওকে। আমি থাকতে থাকতেই নতুন আরেকজন এল। জিজ্ঞেস করে জেনে নিল কি হয়েছে। ব্যস, আর কোন কথা নেই। পাশেই ছিল লাকড়ির দোকান। গিয়ে শক্ত আর মোটা দেখে একটা লাকড়ি তুলে নিয়ে এসে লোকটার কজিতে দমাদম করে বাড়ি মারতে লাগল। শক্ত খুঁটিতে বাঁধা হাত। বাড়িগুলো হাড়ে লেগে খুঁটিতে বাধা পেয়ে ফিরে আসতে লাগল। মা-গো বলে একটা চিৎকার দিয়েই চুপ হয়ে গেল লোকটা। মার খেয়ে অনেক চেঁচিয়েছে, আর চেঁচানোরও ক্ষমতা নেই।

বাড়িগুলো দেখলাম আর আমার মনে হতে লাগল কাঠবেরালিটার কথা। একই ভাবে পিটিয়ে মেরেছিল ওটাকেও। ধরলাম ওটা জানোয়ার, কিন্তু মানুষের প্রতিও কি মায়া নেই মানুষের! এই আচরণ করে কি ভাবে! মনে হচ্ছিল, যারা মারছে তারা মানুষ নয়, মানুষের চেহারার অন্য কোন জীব।

লোকটাকে বেদম মারল ওরা। তারপর একজন বলল, 'এভাবে হবে না। এক আনা দিয়ে একটা ব্লেড কিনে নিয়ে আয়। এঁকে ফেল সারা শরীর।'

এঁকে ফেল বলে কি বোঝাতে চেয়েছে বুঝতে অসুবিধে হয়নি। আর থাকতে পারলাম না ওখানে। বইগুলো শক্ত করে ধরে ছুটতে শুরু করলাম বাসার দিকে। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকলাম। সামনে পড়ল আব্বা। জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে। সব বললাম তাকে। যে প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছিল মনে, জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'আব্বা, ওরা কি মানুষ?'

একটা মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে রইল আব্বা। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'না, ওরা মানুষ না।'

'তাহলে ওরা কি?'

'জানি না!'

শওকত এবং টুনটুনি

আমার এক বন্ধু ছিল, শওকত হোসেন। আনসার অ্যাডজুটেন্টের ছেলে। ভাব হতেও দেরি হত না দুজনের, আবার ঝগড়া হতেও না। তবে ঝগড়াটা একটু অন্য রকম। মারামারির পর্যায়ে তো যেতই না, এমন কি গালাগাল কিংবা কথা কাটাকাটিও নয়। ঠকানোর চেষ্টা চলত একজন আরেকজনকে।

কি রকম ঝগড়া করতাম বলি। শীতের সকালে মারবেল খেলছিলাম। ইস্কুল ছুটি। মারবেল খেলে ওই পাড়ায় আমার সঙ্গে কেউ পারত না, তাই কেউ খেলায় নিতে চাইত না।

প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ছিল আমার। কোনমতে একটা মারবেল হাতে পেলেই হয়, একটা দিয়েই জিতে নিতাম অনেকের মারবেল। ওগুলো আমি খরচ করতাম গুলতির গুলি বানিয়ে। মারবেল গোল আর ভারি বলে পাথর, ইঁটের টুকরো এমন কি মাটি দিয়ে তৈরি গুলির চেয়েও সোজা যায়, আর আঘাতও করে মারাত্মক। ঠিকমতো লাগলে জালালি কবুতরের মত পাখিও চিত হয়ে যায়।

একটা সময় এল, যখন পারে না বলে আমাকে আর খেলায় নিতে চায় না কোন ছেলে, মারবেল ধার দেয়া তো দূরের কথা। একদিন অনেক করে চেয়ে, অনুরোধ করেও কাউকে রাজি করাতে পারলাম না খেলায় নিতে। রেগেমেগে শেষে হাফপ্যান্টের একটা ধার উঁচু করে ওদের মারবেল খেলার গর্তে একটা বিশেষ কর্ম করে দিয়েই ছুটে পালালাম। হইহই করে তাড়া করল ওরা আমাকে। তখন ধরতে পারলে বেশ কিছু তাল পড়ত পিঠে, পারেনি তাই রক্ষা। পরে অবশ্য আর কিছু করল না আমাকে, তবে একঘরে করল। বুঝে গেলাম সেই মৌসুমে আমার মারবেল খেলা শেষ। যে ছেলেটা ওদের দলপতি সে ছিল বেশ ত্যাঁদড়, নামটা এখন আর মনে নেই। তবে মনে আছে, তার বাবা ছিলেন চোখের ডাক্তার। ডাক্তার মাক্কু মিয়া। ডিসপেনসারিতেই অপারেশন করতেন চোখ। ফেনী শহরের আশপাশের অনেক জায়গা থেকে তাঁর কাছে রোগী আসত। অনেকেরই চোখ অপারেশন করা হত। তাদেরকে রাখা হত ডাক্তার সাহেবের বাসায়। বাসাটাই ছিল আবাসিক হাসপাতাল।

সেবারের মত মারবেল খেলার পাট তো ঘুচল আমার। তবে সময় কাটানোর অসুবিধে নেই। হাজারটা উপায় আছে। সেদিন সকালে উঠে বসে বসে সেকথাই ভাবছি। এই সময় একগাল হাসি নিয়ে এসে হাজির শওকত। গোলগাল চেহারা, ফর্সা, ঝকঝকে সাদা দাঁত। জিজ্ঞেস করল, 'মারবেল খেলবি?'

অবাক হলাম। গাধা নাকি? আমাকে যে একঘরে করা হয়েছে, ঘোষণাটা শোনেনি? মনে হয় শোনেনি, তাহলে খেলতে আসত না। নাকি শুনেছে? এসেছে আমাকে খোঁচাতে? ফাঁদে পা দিলাম না। জবাব দিলাম না ওর কথার।

'কি হলো?' পকেট থেকে একমুঠো মারবেল বের করল শওকত। 'খেলবি না?'

বুঝলাম, ঘোষণা তার কানে পৌঁছায়নি। খুশিমনে চৌকির নিচে ঢুকে ঘরের কোণে লুকিয়ে রাখা ল্যাকটোজেনের টিন খুলে বের করে আনলাম চারটে মারবেল। অন্য ছেলেদের ভয়ে বাইরে কোথাও গিয়ে খেলা নিরাপদ নয়, তাই আম্মার মারের ভয় উপেক্ষা করেও বাসার পেছনের ছোট একটা পেয়ারা গাছের নিচে খেলার ব্যবস্থা করলাম।

তারপর যা হওয়ার তাই হলো। হেরে গেল শওকত। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর ওরই মারবেল আমার কাছ থেকে পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে খেলতে লাগল। আবার হারল। ওর দুই-পকেট মারবেল আর চার আনা পয়সা চলে এল আমার পকেটে। অনেক কাকুতি-মিনতি করে আর হাতে পায়ে ধরার পর কিছুটা বিরক্ত হয়েই চার আনা থেকে একটা আনা ওকে দিয়ে দিলাম। ও তখন প্রস্তাব দিল, পয়সা খেলার জন্যে। পয়সা খেলাটাও অনেকটা মারবেল খেলার মত করেই খেলতে হয়। তফাৎ শুধু একটা খেলতে হয় মারবেল দিয়ে আরেকটা মুদ্রা দিয়ে। সরাসরি পয়সা দিয়ে খেলাটা আমার কাছে

জুয়ার মত মনে হত, তাই খেলতাম না।

আমি রাজি না হওয়ায় মন খারাপ হয়ে গেল তার। প্রস্তাব দিলাম, 'চল, পাখি মারতে বেরোই।' ও রাজি হলো না। মুখ ভার করে চলে গেল।

আমাদের বাসার ভেতরে আমগাছের নিচে ছোট ছোট কয়েকটা গাছ ছিল। বড় বড় পাতা। আসল নাম জানি না। আঞ্চলিক নাম ডোংরা গাছ। গাছগুলোর প্রতি বেশ দুর্বলতা ছিল আমার। তার কারণ, ওগুলোর পাতা বড় বলে টুনটুনির বাসা বাঁধতে সুবিধে। আর বাঁধতও ওরা এসে প্রচুর, জোড়ায় জোড়ায়। ডিম পাড়ত।

ডিম পাড়ার সময় হলেই নজর রাখতাম পাখিগুলোর ওপর। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোত। পালক গজিয়ে ওড়ার সামর্থ্য হলে মায়ের সঙ্গে বাসা থেকে বেরিয়ে আসত খুদে বাচ্চাগুলো। গলা লম্বা করে ঠোঁট ফাঁক করে, টিইক টিইক করে চিৎকার করত। অবাক হয়ে ভাবতাম, অতটুকুন বাচ্চা এত জোরে চেঁচায় কি করে? গলায় এত জোর! দেখেশুনে একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল আমার, বাচ্চা হলেই চেঁচাবে এবং গলায় জোর থাকবে, তা সে যারই বাচ্চা হোক। মানুষের বাচ্চাও তো কম জোরে চেঁচায় না।

মারবেল খেলে আমার সঙ্গে হারার পর তক্কে তক্কে ছিল শওকত। কিভাবে প্রতিশোধ নেয়া যায়। মারবেলগুলো না হোক, অন্তত তিন আনা পয়সা আদায় করা যায়। পেয়ে গেল সুযোগ।

একদিন একটা টুনটুনিকে দেখলাম ডোংরা গাছের সরু ডালে বসে ঝিমাতে। কাছে গেলাম, উড়ল না পাখিটা। হাত বাড়ালাম, তা-ও গেল না। ঢুলুঢুলু চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে। কি ব্যাপার? অসুখ নাকি? না ধানখেতে পোকার ওষুধ খেয়ে এসেছে পোকা খেতে গিয়ে? মারাত্মক বিষ ওই পোকার ওষুধ।

মায়া হলো। পাখিটাকে ধরে নিয়ে এলাম সেবা করার জন্যে। কিন্তু কি করে সেবা করব? জানি তো না। আর কিছুই করতে না পেরে ওটাকে হাতের তালুতে নিয়ে, হাত বোলানোর পরিবর্তে পিঠে আদর করে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগলাম। এতটুকুন পাখি, আঙুল বোলানোও মুশকিল।

বাইরের ঘরের সিঁড়িতে বসে পাখিটাকে আদর করছি, এই সময় এল শওকত। আমার হাতে জ্যান্ত টুনটুনি দেখে চোখ বড় বড় করে ফেলল। জিজ্ঞেস করল, 'বেচবি?'

'না,' মানা করে দিলাম।

'পয়সা দেব।'

'না।'

'সত্যি দেব,' বলে পকেট থেকে একটা দু-আনি বের করল।

ওর এই পয়সা পাওয়ার ব্যাপারটা একটা রহস্য আমার কাছে। কোথায় পায় এত? যখন তখন বের করে ফেলে পকেট থেকে। ওর আম্মা নিশ্চয় এত দেন না। আমার মায়ের কাছ থেকে তো একটা আনা বের করতেই আমার ঘাম ছুটে যায়। তার মানে বাপের পকেট মারে। তাছাড়া পয়সা পাওয়ার আর তো কোন পথ দেখি না। তবে রহস্যটা কোন দিন আমার কাছে ফাঁস করেনি শওকত, যতই বন্ধু হোক।

দু-আনিটা দেখে চোখ চকচক করে উঠল আমার। তবু দাম বাড়ানোর জন্যে

বললাম, 'দেখ, পাখি হলো মানুষের মত। মানুষকে যেমন বিক্রি করলে গোলাম হয়ে যায়, পাখিও হয়ে যায়। বইয়ে পড়িসনি গোলামদের কত কষ্ট? তোর কাছে বেচলে পাখিটাও কষ্ট পাবে। বলা যায় না, নিগ্রো গোলামদেরকে যেমন চাবুক মেরে ছাল তুলে দিত ওদের মনিবরা, তুইও তেমন করতে পারিস।'

'পাখির ছাল আসবে কোত্থেকে?'

'আছে। পালকের নিচে।'

'অত নিচে চাবুকের বাড়ি লাগবে না।'

'তাহলে পালকে তো লাগবে। হয়তো পালকই তুলে দিবি।'

সে বলল, 'মাথা খারাপ নাকি তোর! একটা পাখিকে এমন করব! আমাকে দে, সেবাযত্ন করে ভাল করে তুলে পুষব। একটুও কষ্ট দেব না। লক্ষ্মী ভাই আমার, দিয়ে দে। দু-আনাই দেব। একটা পাখি পোষার আমার বড় শখ। দে, দিয়ে দে।'

বললাম, 'চার আনা হলে দিতে পারি।'

পকেট উল্টে দেখাল শওকত। আর একটা পয়সাও নেই।

বললাম, 'দেখ, এটা খুব ভাল পাখি । এটাকে খাঁচায় পুরতে পারবি না। তাহলে দেব না।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল শওকত, 'না না, খাঁচায় ভরব না। বলিস কি! এত সুন্দর একটা পাখিকে খাঁচায় ভরব? কক্ষণো না।'

বললাম, 'হ্যাঁ, ভরবি না। চাঁপাকলা খেতে দিবি। দেখবি, কত ভালবাসবে তোকে। ধানখেত থেকে কত পোকা এনে দেবে···'

ফস করে শওকত বলে উঠল, 'পোকা দিয়ে আমি কি করব?'

তাই তো! পোকা দিয়ে ও কি করবে? ঘিনঘিনে কিলবিলে শুঁয়াপোকা···তাড়াতাড়ি ওর দিকে পাখিটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'নে। পয়সা দে।'

ঘরের ভেতর থেকে *পয়সা* শব্দটা বোধহয় আম্মার কানে গেল। ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'এই, পয়সা-পয়সা করছিস কেন? কি হচ্ছে?'

তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, 'না, কিছু না। শওকতের কাছে দু-আনা পয়সা আছে তো, লজেন্স খেতে যেতে বলছে।' ইশারায় ওকে বললাম, পাখিটা নিয়ে জলদি কেটে পড়তে।

একটা আধমরা পাখির বিনিময়ে দু-আনা পয়সা পেয়ে যেন মহারাজা বনে গেলাম। বসে বসে ভাবতে লাগলাম, কি কি খাওয়া যাবে। দু-পয়সার ছোলা ভাজা, দু-পয়সার চিনাবাদাম, আর বাকি একআনা দিয়ে দুটো লজেন্স···

ভাগ্যিস খেয়ে ফেলিনি, তাহলে মহা বিপদে ফেলে দিত আমাকে শওকতটা। ঘন্টাখানেক পরেই পাখি হাতে এসে হাজির। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'তুই আমাকে বেরামওলা পাখি দিয়েছিস! নেয়ার পরই মরে গেছে।'

আমি কি আর সে কথা মানি? সমান তালে চেঁচিয়ে বললাম, 'না, ভাল পাখি দিয়েছি! তুই কিছু করে মেরেছিস!'

'না, আমি কিছু করিনি!'

'নিশ্চয় করেছিস! নইলে ভিজল কি করে?'

'ভিজবেই তো। গোসল করিয়েছি। খেতে দিয়েছি। রোগীর সেবা করব না? কিন্তু এটা ছিল কলেরার রোগী। বাঁচবে কি করে? আমার হাতে একবার পিচিক করে দিয়েই মরে গেল!'

তর্ক শুরু করলাম, 'পানিতে চুবাতে গিয়েই তুই মেরেছিস!'

সে-ও মানতে রাজি না, আমিও না। শেষে রেগে গিয়ে সে বলল, 'তুই পয়সা ফেরত দিবি কিনা বল! নইলে আমি চললাম খালাম্মাকে বলতে! মরা পাখি দিয়ে তুই আমার কাছ থেকে ঠকিয়ে পয়সা নিয়ে গেছিস!'

ঘাবড়ে গেলাম। মরা কেন, জ্যান্ত পাখি দিয়েও যদি দু-আনা নিই, তাহলেও নারকেলের শলার প্রচুর বাড়ি হজম করতে হবে আমাকে। প্রথমেই শাস্তি হবে একটা পাখিকে ওভাবে ধরলাম কেন, সে জন্যে। তারপর বিক্রি করে পয়সা নেয়া! ওরিব্বাপরে বাপ! শওকতের কথা বিশ্বাস করবে আম্মা, কারণ ওরকম কাজ করতে পারি একথা জানা আছে তার। তাছাড়া একটু আগেই শুনেছে পয়সার কথা বলাবলি করছি আমরা।

পকেট থেকে দু-আনিটা বের করে ফেলে দিলাম তার হাতে।

মরা পাখিটা আমার কোলে ছুঁড়ে মারল শওকত। তারপর দাঁত বের করে হেসে বলল, 'এইবার আমি খালাম্মাকে বলতে যাচ্ছি, তুই তিন আনায় আমার কাছে পাখি বিক্রি করেছিস। পয়সা ফেরত দিচ্ছিস না।'

আকাশ থেকে পড়লাম। 'বলিস কি! দিলি তো মোটে দু-আনা! দিয়ে দিয়েছি! আরও তিন আনা এল কোত্থেকে?'

দাঁত বের করে হেসে বলল সে, 'কেন, সেদিন মারবেল খেলার সময় নিলি না চার আনা? এক আনা দিয়েছিস। বাকি আছে তিন আনা। দিলে দে, নইলে গেলাম খালাম্মার কাছে।'

ভাল বেকায়দাতেই ফেলেছে আমাকে সে। মারবেল খেলে পয়সা জিতেছি শুনলেও সেই অপরাধে শাস্তি পেতে হবে আমাকে। ওদিকে আমার কাছে তখন একটা ফুটো পয়সাও নেই। কাজেই ওর হাতে-পায়ে ধরা ছাড়া আর কোন উপায় নেই আমার। অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর সে রাজি হলো, পয়সা পরে নেবে।

বললাম, একবারে তো দিতে পারব না, ভেঙে ভেঙে দেব।

তাই দিয়েছিলাম। পুরো তিন আনাই আমার কাছ থেকে আদায় করে ছেড়েছিল শওকত।

এত যে লাগালাগি করতাম, তার পরেও ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নষ্ট হয়নি কোন দিন। পয়সাগুলো আমার কাছ থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল সে ঠিকই, কিন্তু ওই পয়সা দিয়ে লজেন্স-বিস্কুট খাওয়ার সময় আমাকেও ভাগ দিয়েছে। বরং কিছুটা বেশিই দিয়েছে।

ভূতুড়ে সন্ধ্যা

ঝমঝম বৃষ্টি হলো সারাদিন। প্রচণ্ড বৃষ্টি। কালো হয়ে রইল আকাশ। কি করব? ঘর থেকে বেরোনোর উপায় নেই, কেবলই ঘরে বসে থাকা। পড়ার টেবিল ছাড়াও একটা বিশেষ জায়গা ছিল আমার। তা হলো খাটের পেছনে ঘরের কোণ। একা একা আমার যত খেলা, বই পড়া, ছবি আঁকা, সব ওখানটাতে। তবে সেটা রোদ থাকলে। বৃষ্টি হলে আলো ততটা পৌঁছায় না ওখানে। আর জানালা খুলতে না পারলে তো একেবারেই অন্ধকার। বিদ্যুৎ ছিল না আমাদের পাড়ায়, হারিকেন জ্বালাতে হত। দিনের বেলা ওই মিটমিটে আলো ভাল লাগত না। তাই প্রায় বসেই কাটাতে হলো সেদিন। মাঝে মাঝে বাতাসের বেগ কমলে আমার ঘরের একটা জানালা খুলে বিছানায় পা দুলিয়ে বসি। তাকিয়ে থাকি বাইরের দিকে। ঝোড়ো বাতাসে দোলে নারকেল-সুপারির মাথা। গুটিসুটি হয়ে থাকে আড়ালে-আবডালে লুকিয়ে থাকা ভেজা কাক। অন্য কোন পাখি, এই যেমন চড়ুই, দোয়েল কিংবা শালিক একটাও চোখে পড়ল না। বৃষ্টির জন্যে কোন বন্ধুর বাড়িতে যেতে পারি না। ওরাও কেউ আসতে পারে না। সে এক সাংঘাতিক অবস্থা।

তবে সারাটা দিন যে শুধু বিরক্তি নিয়েই কেটেছে, তা নয়। দুপুরে টাটকা ঘি দিয়ে গরম গরম খিচুড়ি খেয়েছি। মাঝে সাঝে সামসু কিংবা আপার সঙ্গে লুডু খেলেছি। বেশ ভালই লেগেছে।

বিকেলের দিকে ধরে এল বৃষ্টি। কিন্তু আকাশের মুখ গোমড়াই রইল। যখন তখন বর্ষণ শুরু হতে পারে আবার। হোক। আর থাকতে পারব না ঘরে। বেরিয়ে পড়লাম।

বাসা থেকে বেরিয়ে একটা মোড় ঘুরলেই দীঘি, তার সামনে বেশ বড় একটুকরো ঘাসে ছাওয়া জমি। পানিতে ভরে আছে। একধারে একটা বড় তুলা গাছ। বড় বড় দুটো পাখি দেখলাম। অবাক লাগল। কি ওগুলো? এমন পাখি তো দেখিনি! কৌতূহল হলো। আরেকটু কাছে গিয়ে চিনতে পেরে হেসে ফেললাম। বুলবুলি। বৃষ্টিতে ভিজেছে বোধহয়, ভেজা পালক শুকানোর জন্যে রোম ফুলিয়ে একেবারে অন্য পাখি হয়ে বসে আছে।

আমি একা। আর কাউকে দেখলাম না। দমে গেল মনটা। সারাদিনের পরেও একা একা খেলতে হবে? কিন্তু আর কেউ নেই যখন কি আর করা। পানিতে পা টেনে টেনে হাঁটতে শুরু করলাম। ঝঅঅল ঝঅঅল করে আওয়াজ হয়। পানি আটকে যায় পায়ে। এক ধরনের বিচিত্র অনুভূতি হয় যা বলে বোঝানো যায় না।

কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এল সোনা হাজারির ছেলে ননু। পেয়ে গেলাম সাথী। আর কোন অসুবিধে নেই। শুরু হয়ে গেল দুষ্টুমি। কিন্তু বেশিক্ষণ পারলাম না। ঘর থেকে মুখ বের করলেন ওর বাবা। দেখেই ধমক লাগালেন। জলদি পানি থেকে উঠতে বললেন, আমাকে সহ। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হতে পারে তাই।

যাহ্, গেল! যা-ও বা সারাদিন পর একটা খেলা পেয়েছিলাম, তা-ও গেল। অসহায়

দৃষ্টিতে তাকালাম একে অন্যের দিকে। ননু প্রস্তাব দিল, 'চল ঘাটলায় (দীঘির ঘাট) গিয়ে বসি।'

কিন্তু গিয়ে বসতে না বসতেই ডাক দিলেন ননুর স্যার, 'এই হাতমুখ ধুয়ে পড়তে আয়।' ওদের বাড়িতে লজিং থাকেন তিনি। সময়ে-অসময়ে খালি পড়তে ডাকেন। কথা না শুনলেই বেতের বাড়ি।

দেখার মত চেহারা হয়ে গেল ননুর। করুণ চোখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। বিড়বিড় করে বলল, 'আমার আব্বাটা কেন যে তোর আব্বার মত হলো না! তুই সারাদিন না পড়লেও তোকে কিচ্ছু বলে না। আর আমাকে...'

কথাটা শেষ করল না সে। চলে যেতে বাধ্য হলো। ও চলে যাওয়াতে আমিও নিরাশ হয়ে পড়লাম। আর কেউ নেই। একা একা কি করব? তাকিয়ে রইলাম দীঘির পানির দিকে। ছোট ছোট ডানকানা মাছ কিলবিল করছে। মনে হলো, আহা, ওরা কত সুখী। মানুষ না হয়ে যদি ওই মাছ হতাম তাহলেও অনেক ভাল ছিল! পানিতে থাকতে পারতাম, বৃষ্টিকে কেয়ার করতে হত না। মুক্ত, স্বাধীন জীবন। মানুষ হওয়ার অনেক যন্ত্রণা।

'অ্যাই কি দেখছিস?' কানের কাছে কথা শুনে চমকে গেলাম। ফিরে তাকিয়ে দেখি, আমাদের দুধওয়ালার ছেলে, নামটা সম্ভবত করিম, ঠিক মনে নেই।

'অ্যাঁ! কিছু না।' হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক, কথা বলার অন্তত একজন মানুষ পাওয়া গেল।

'বসে বসে কি করছিস?' গলায় জোর নেই ওর। ক্লান্ত কণ্ঠস্বর।

'কিছু না। তুই কোথাও যাচ্ছিস মনে হয়?'

'হ্যাঁ, হিন্দু পাড়ায়। যাবি? আমাদের ধলাগাইটাকে পাচ্ছি না। দেখি গিয়ে আছে নাকি।'

'এখন?' কালো আকাশের দিকে তাকালাম। সন্ধ্যার বেশি বাকি নেই। বাদল দিনের সন্ধ্যা, এমনিতেই তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যায়। তার ওপর আকাশে ভারি মেঘ জমে আছে বলে আরও দ্রুত নামবে।

'চল। যাব আর আসব।'

কিছু একটা করার জন্যে তৈরিই হয়ে আছি। ভাবলাম, যাইই না। এভাবে চুপ করে বসে থাকার চেয়ে তো ভাল।

দীঘির পাড় ধরে হেঁটে চললাম আমরা। রাস্তার মোড় ঘুরে চললাম পুবে। কিছুদূর এগোতে একপাশে গোরস্থান পড়ল। একটা নতুন কবর দেখাল আমাকে করিম, 'দেখ, কে জানি মরে গেছে।'

কবরটা দেখে অস্বস্তি জাগল মনে। কলেরা শুরু হয়েছে তখন। রোজই একজন দুজনকে মরতে শোনা যায়। থমকে দাঁড়ালাম। বললাম, 'করিম, আমি যাব না।'

'দূর, ভীতুর ডিম! চল।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা বাড়ালাম ওর সঙ্গে। বার বার ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলাম কবরটার দিকে।

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে লাগল। কয়েক পা এগোতে না এগোতেই নামল ঝুপঝুপিয়ে। একটা ব্যাপার শুরু থেকেই লক্ষ করেছি। করিমের মুখচোখ শুকনো। পা টেনে টেনে হাঁটছে ক্লান্ত মানুষের মত।

বৃষ্টি নামতেই ছুটতে শুরু করলাম। বাসা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলে ভিজব। তাই সামনের কয়েকটা কুঁড়ের দিকে এগোলাম। একটা ঘরের চালার নিচে বেড়া ঘেঁষে দাঁড়ালাম আমরা। ফুটখানেক কিংবা আরেকটু বেশি বেরিয়ে আছে চালাটা, তাতে শুধু মাথাটাই বাঁচে। পা ভিজে যায়।

দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল করিম।

কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে বললাম, 'কি রে, চুপ হয়ে গেলি কেন?'

'উঁ,' করে আবার চুপ হয়ে গেল সে।

'অ্যাই, করিম?'

কথা বলল না সে। অস্বস্তি বাড়তে লাগল আমার। অন্ধকার হয়ে এসেছে। রাত নামতে বাকি নেই। আচমকা ভাঙা ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'এই দ্যাখ দ্যাখ, ওটা কি!'

ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। গোরস্থানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। সেদিকে তাকিয়ে আমার চোখে কিছুই পড়ল না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কই? কী?'

'আরে ওই তো! দেখছিস না? ওই যে, নতুন কবরটার কাছে।'

কবরস্থানে ভূত থাকে জানতাম। বিশেষ করে যারা অপঘাতে মরে তারা তো ভূত হয়ই হয়। সন্ধ্যার পর জেগে উঠে সারারাত জ্বালিয়ে মারে মানুষকে, ফজরের আজান পড়লেই আবার কবরে গিয়ে সেঁধোয়।

এই সময় খেয়াল করলাম, মসজিদে আজান হচ্ছে। গাঁয়ের মসজিদ। মাইক নেই। তখন বিদ্যুৎ ছিল না। ব্যাটারি দিয়ে মাইক চালানোর মত বড় মসজিদ দু-একটা ছাড়া ছিল না ফেনীতে। বৃষ্টিভেজা আবছা অন্ধকারে, নির্জন গাঁয়ের মধ্যে দূর থেকে ভেসে আসা মোয়াজ্জিনের কাঁপা কাঁপা কণ্ঠ অদ্ভুত বিষণ্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করল। বহুবার লক্ষ করেছি, সাধারণ সময়েও ওসব জায়গায় মাগরিবের আজানের সময় কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যেত পরিবেশ। হুট করেই যেন স্তব্ধ হয়ে যেত প্রকৃতি। একেবারে ধ্যানমগ্ন। গাছের পাতাটিও নড়ে না। বাচাল বুলবুলি নীরব, শালিকের কান ঝালাপালা করা কিচিরমিচির স্তব্ধ, এমন কি মুহূর্ত আগেও যে ফিঙেটি পোকা ধরার জন্যে অস্থির হয়ে ওড়াওড়ি করছিল সেও চুপ। মনে হত, সবাই যেন কিসের প্রতীক্ষারত, কিংবা মৌন হয়ে প্রণতি জানাতে তৈরি হচ্ছে স্রষ্টার পায়ে। ধীরে ধীরে নীলচে হয়ে আসত গোধূলির আলো, মসজিদ থেকে ভেসে আসত ইমাম সাহেবের সুরেলা কণ্ঠ ঃ আল্লা-হুয়াকবার, আল্লা-হুয়াকবার...

বৃষ্টির দিনে আজানের সময় তৈরি হয় আরেক পরিবেশ। সাংঘাতিক বিষণ্ণতায় ছেয়ে যায় যেন প্রকৃতি, ভারি করে তোলে মন। তবে সেদিন ওসব দেখার মত অবস্থা ছিল না আমার। করিমের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। ঘোলাটে হয়ে উঠেছে ওর চোখ, চেহারা ফ্যাকাসে। আরেকবার কবরস্থানের দিকে হাত তুলে ফিসফিস করে বলল, 'ওই যে! মাথা নেই। পেটের কাছে বড় বড় চোখ! আগুনের মত!'

নানীর কাছে শুনেছিলাম, কলেরার ডাইনী নাকি এই রূপ ধরেই আসে। যে দেখে তাকে ধরে। তারপর টেনে নেয় নিজেদের দলে।

করিমের ওই কথা শোনার পর আর একটা মুহূর্তও দেরি করলাম না। বৃষ্টিতে ভেজার পরোয়া না করে ঝেড়ে দিলাম দৌড়। পেছনে ফিরেও তাকালাম না একটিবার। ছুটতে ছুটতে একেবারে বাসায়। সারাটা রাত আতঙ্কের মধ্যে কাটালাম। দুঃস্বপ্ন দেখলাম।

পরদিন সকালে খবর পেলাম, ভোররাতে কলেরায় মারা গেছে করিম। তখন বিশ্বাস করেছিলাম ওকে কলেরার ডাইনীতেই ধরেছে। বড় হয়ে ওই অদ্ভুত ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। ভূতপ্রেতে বিশ্বাস নেই আমার। একটা ব্যাখ্যাই হতে পারে, আমাকে যখন ডাকতে এসেছিল সে, তার আগেই শরীরে ঢুকে গিয়েছিল কলেরার জীবাণু। চেহারা শুকনো শুকনো লাগছিল সে জন্যেই। তারপর যখন প্রথম আঘাতটা হানল মারাত্মক জীবাণুর দল, তখন হ্যালুসিনেশন দেখতে আরম্ভ করল সে। একটা ঘোরের মধ্যে রইল। উদ্ভট কিছু দেখছে বলে প্রলাপ বকতে থাকল।

আমার কথা আমি বললাম। ডাক্তার সাহেবরা কি ব্যাখ্যা দেবেন জানি না।

তরমুজ চোর

চৈত্রের শেষ তখন। ভোর রাতে কনকনে শীত পড়ে, দিনে প্রচণ্ড গরম। সেদিন দুপুর বেলা, বেলা এই বারোটা-একটা হবে। বাড়িওয়ালার বৈঠকখানার বারান্দায় বসে আছি। হাতে গুলতি। সকাল থেকেই পাখি মারার চেষ্টা করেছি। সারাটা শীতকাল পাখির পেছনে ঘুরেছি, ফলে আশপাশের যত শালিক দোয়েল আর চড়ুই আছে, সবগুলোর কাছে চেনা হয়ে গেছি। আমাকে গুলতি হাতে দেখলেই পালায়। ফলে সেদিন একটাকেও লাগাতে পারিনি।

কি করা যায় বসে বসে ভাবছি। এই সময় এসে হাজির হলো আমার বন্ধু শওকত। তার সেই দাঁত বের করা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি করছিস? পাসনি কিছু?'

মাথা নাড়লাম , 'না। সব চালাক হয়ে গেছে।'

ও প্রস্তাব দিল, 'চল, দূরে কোথাও যাই।'

কথাটা ভেবে দেখার মত। ওই এলাকা থেকে সরে গেলে হয়তো পাখি পাওয়া যাবে। অন্য জায়গার শালিকগুলো নিশ্চয় অতটা চালাক নয়। রাস্তার পাশে ধুলোয় ধূসর গাছপালায় বসে এখন অলস ভঙ্গিতে কিঁচক কিঁচক করবে, পেট চুলকাবে, কিংবা পাতার আড়ালে বসে ঝিমাবে। আমাকে দেখেও সচকিত হবে না। এই সুযোগে দেব ধাম করে লাগিয়ে।

একা একা দূরে যেতে ভাল লাগে না। একজন সঙ্গী পেয়ে আর দ্বিধা করলাম না। রাজি হয়ে গেলাম। রওনা হয়ে গেলাম দুজনে।

পুবে প্রায় মাইল দেড়েক দূরের একটা গ্রামে চলে এলাম। তখন হিন্দুদের বাড়িঘর বেশি ছিল ওই গ্রামে। এতটা পথ এসেও কিন্তু একটা পাখি পাইনি। মনে হতে লাগল, পাখি মারার আশা ছাড়তে হবে। চৈত্রের হু-হু বাতাসে ধুলো উড়ছে। ফড়িঙ উড়ছে। বসন্তের শেষাশেষি সমস্ত গাছপালাই তখন বড় বেশি সতেজ, সবুজ।

বললাম, 'চল, ফিরে যাই।'

ও বলল, 'এত জলদি কিসের? পাখি না নিয়ে যাব না আজ। যত দেরি হয় হোক।'

'কিন্তু খিদে পেয়েছে যে।'

'কেন, খেয়ে বেরোসনি?'

'না। সকালে বেরিয়েছি। বাসায় গেলেই আটকে দেবে আম্মা, আর বেরোতে পারব না। তাই যাইইনি।'

'ও। তাহলে তো মুশকিল। পয়সা-টয়সা নেই তোর কাছে?'

'একটা ফুটো পয়সাও না।'

'হুঁ,' গম্ভীর হয়ে গেল শওকত। 'চল, তাহলে ফিরেই যাই। খালি পেটে নিশানা ঠিক থাকে না। চল, ওদিক দিয়ে ঘুরে যাই।'

ভীষণ গরম লাগছে তখন। পেটে খিদে। হাঁটতেই ইচ্ছে করছে না আর। গাছের নিচ থেকে বেরোলেই রোদ যেন ছ্যাঁকা দেয় গায়ে। তাই যতটা পারলাম ছায়ায় ছায়ায় এগোলাম।

কুল গাছে একটা ফিঙেকে বসে থাকতে দেখলাম। শওকত বলল, 'মেরে দে ওটাকেই।'

'না, অযথা...'

'আরে দূর,' বাধা দিয়ে হাত নেড়ে বলল শওকত, 'কিছুই তো পেলাম না। মার ওটাকে।'

গুলতি তুলে তাক করতেই বোধহয় পোকা চোখে পড়ল ফিঙেটার। উড়ে গেল। আর ফিরল না। নাহ্, আজ কপাল বড়ই খারাপ।

আরও খানিক দূর এগোলাম। গলা শুকিয়ে গেছে। হিন্দুবাড়ির টিউবওয়েল থেকে পানি খেয়ে নিয়ে বসলাম কামরাঙা গাছের নিচে জিরাতে।

কিলডিক! কিলডিক! দুইবার ডেকে উঠল পাখিটা। ওপর দিকে মুখ তুলে দেখলাম, ঠিক মাথার ওপরে নিচু ডালে বসে আছে একটা বুলবুলি। মুহূর্ত দেরি করলাম না, শওকতের বলার অপেক্ষায় থাকলাম না, দিলাম গুলতি মেরে।

পড়ে গেল পাখিটা। একটা ডানা ভেঙেছে শুধু। মরেনি। মাটিতে পড়েই তড়পাতে তড়পাতে ছুটল ঝোপের দিকে। পেছনে ছুটল শওকত। বাউলি কেটে তার হাত ফসকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল বুলবুলি, পারল না। শালিক কিংবা চড়ুই হলে ঠিকই পালাত। অনেক বেশি চালাক আর ক্ষিপ্র ওগুলো। লাফিয়ে লাফিয়ে ছোটে। কিন্তু বুলবুলি বোকা। ধরা পড়ে গেল।

শওকতের হাসি দেখে কে। দাঁত সব বেরিয়ে পড়েছে ওর। কাছে এসে বলল, 'পাওয়া যাবে, বুঝলি। সামনে এগোলে আরও পাখি পাওয়া যাবে।'

'তা তো যাবে,' আমারও বিশ্বাস ফিরতে আরম্ভ করেছে। 'কিন্তু পেটে যে খিদে।'

'তাই তো!' মনমরা হয়ে গেল আবার শওকত।

পানি খেয়ে, জিরিয়ে, আর একটা পাখি পেয়ে শক্তি যেন কিছুটা বাড়ল বলে মনে হলো আমার। এগিয়ে চললাম। হিন্দুপাড়া পার হয়ে এসে একটা খেতের পাশ দিয়ে চলেছি। ঝাঁ ঝাঁ রোদ। ওই খেতের ধার দিয়ে অনেকটা ঘুরে গিয়ে বেরোতে হবে। এত রোদের মধ্যে যেতে ইচ্ছে করছে না।

পাখিটা ছটফট করছে শওকতের হাতে। বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে আধখানা ব্লেড বের করে আমাকে দিয়ে পাখির পা ধরাল। তারপর আল্লা-হোয়াকবর বলে দিল জবাই করে। ব্লেডের রক্ত ঘাসে মুছে নিতে লাগল। এই সময়ই খেতের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরে চোখ পড়ল তার। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চুটকি বাজিয়ে বলল, 'পেয়ে গেছি!'

'কি পেয়েছিস?'

ফিসফিস করে বলল, 'তরমুজ! তোর না খিদে পেয়েছে বললি? আমারও পেয়েছে। দেখ, কত তরমুজ! একটা আনতে পারলেই পেট ভরে যাবে।'

'তা তো যাবে। কিন্তু আনতে যাবে কে?'

'তুই যা না। গাছটাছ তো ভালই বাইতে পারিস। ওই খেজুর গাছটা বেয়ে উঠে লাফিয়ে ওপাশে নেমে যা।'

'তারপর বেরোব কি করে?'

'তা-ও তো কথা,' মাথা চুলকাল সে। সমাধান দিল, 'ওই গাছ বেয়ে উঠেই বেরোবি। তরমুজটা আমার হাতে দিয়ে নিস, তাহলেই হবে।'

'আমি পারব না,' সাফ মানা করে দিলাম। যদিও খেত থেকে তাজা তরমুজ তুলে এনে খাওয়ার লোভ ষোলো আনাই আছে।

খেতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে শওকত। বুঝলাম, ওর লোভ আমার চেয়ে বেশি। সেটাকে উসকে দেয়ার জন্যে বললাম, 'সেদিন না গপ মারলি, তরমুজ খুব ভাল চিনিস?'

'আমাকে যেতে বলছিস?'

রাজি হয়ে যাচ্ছে। বললাম, 'তাই তো যাওয়া উচিত। আমি চিনিও না। গিয়ে অযথা কাঁচা তরমুজ ছিঁড়ে আনব। খাওয়া যাবে না।' ওর লোভটাকে আরও চাগিয়ে দেয়ার জন্যে বললাম, 'তাজা তরমুজ যা মিষ্টি না! দারুণ লাগে খেতে। তুইই যা। খেয়েদেয়ে পেট ভরে গেলে এক্ষুণি আর বাসায়ও ফিরতে হবে না। গাঙের পাড়ে চলে যাব আজ যা থাকে কপালে। ওদিকে অনেক শালিক আছে। মেরে নিয়ে আসব।'

'যাব?' দ্বিধা করছে শওকত। 'হিন্দুবাড়ির ছেলেগুলো ভারি পাজি। ধরতে পারলে ঠ্যাং ভেঙে দেবে।'

'আরে দূর,' বললাম, 'এই দুপুরবেলা কে দেখতে আসছে? তুই যা, আমি পাহারা দিচ্ছি। কেউ এলে তোকে হুঁশিয়ার করে দেব।'

খেজুর গাছ বেয়ে উঠতে ওকে সাহায্য করলাম। ওপাশে লাফিয়ে নামল সে। আমার দিকে চেয়ে বলল, 'ভালমতো নজর রাখ।'

'রাখব। তুই যা।'

ওর পায়ের কাছেই অনেক তরমুজ। ওগুলোর দিকে না তাকিয়ে আরও বড় আর পাকা তরমুজের আশায় খেতের মাঝখানের দিকে এগিয়ে চলল সে। কিছুদূর গিয়ে নিচু হয়ে টোকা দিয়ে দিয়ে দেখতে লাগল, কোনটা পাকা।

খেতের ধারে গোবর দিয়ে ঘুঁটে বানাচ্ছিল এক মহিলা। সে দেখে ফেলল। চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই কনেরে! (কে রে) ওমা, চোরএনা! ও হরাইন্না (পরাণ), ও ডিব্বা (দীপক), দেখি যা! চোর! চোর! চুরি করি ব্যাক (সব) তরমুজ লই গেল!'

সবার আগে সাড়া দিল একটা কুকুর। ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তার পর পরই তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল আরও কয়েকটা।

ওই বাড়িতে অনেক কুকুর আছে জানি। রাস্তা দিয়ে মানুষ যেতে দেখলেই চেঁচাতে থাকে। চোর ঢুকেছে তরমুজ খেতে, এটা বোঝার পর আর কি রেহাই আছে। দল বেঁধে চিৎকার করতে করতে ছুটে এল ওগুলো।

হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। এরকম ঘটবে কল্পনাই করতে পারিনি।

শওকতও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। তরমুজ খেতে লুকানোর জায়গা নেই। দৌড়ে যে বেড়ার দিকে ছুটে আসবে সে বুদ্ধিও যেন লোপ পেয়েছে।

চার-পাঁচটা ছেলেকে দৌড়ে আসতে দেখলাম। আমাদের চেয়ে বয়েসে তিন-চার বছরের বড় একটা ছেলেকে চিনতে পারলাম। লম্বা টিংটিঙে তালপাতার সেপাই। মহাহারামী। দীঘির পাশের রাস্তা দিয়ে বাজারে যেত। ওকে আমরা খেপাতাম ট্যাংরা বলে। ধরতে পারলে আজ শোধ তুলবে।

শওকতকে কোন সাহায্য করা তো দূরে থাক, নিজেকেই বাঁচাতে পারব কিনা সন্দেহ আছে। কুকুরগুলো যদি ঘিরে ফেলে, তাহলে ধরা পড়ব আমিও। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। আর একটা সেকেণ্ড দেরি না করে ঝেড়ে দিলাম দৌড়। আমাকে দেখল কিনা ছেলেগুলো বুঝতে পারলাম না, তবে পেছন ফিরে তাকালাম না আর। একেবারে দীঘির পাড়ে এসে তারপর থামলাম। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। মনে হচ্ছে ফুসফুস ফেটে যাবে। বড় একটা আমগাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর শুয়েই পড়লাম। বার বার তাকাচ্ছি যেদিক থেকে এসেছি সেদিকে। ভয় এখনও যায়নি। মনে হচ্ছে, ওরাও আমার পিছু নিয়েছে। ধরতে এল বলে।

আস্তে আস্তে ভয় কাটল। গুলতিতে বড় দেখে একটা মারবেল পরিয়ে তৈরি হয়ে রইলাম। ট্যাংরা এলে আগে ওর হাঁটুতে মারব। তারপর দেখা যাবে। বাসার কাছে এসে গেছি। এখন আর ভয় করি না।

এল না ট্যাংরা। শওকতও এল না। দুপুর পেরিয়ে গেছে অনেক আগে। সূর্য আমগাছের মাথার ওপাশে পশ্চিমে হেলছে। আজ কপালে নারকেলের শলার বাড়ি আছে। বাসায় ঢুকলেই প্রথমে গুলতিটা কেড়ে নেবে আম্মা। কান ধরে ওটা দিয়েই প্রথমে খানকয়েক বাড়ি, তারপর হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ভেতরের ঘরে। ওখানে চলবে মূল ধোলাইপর্ব, আপা এসে আমাকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত। আব্বা অফিসে, কাজেই আপা ছাড়া বাঁচানোর আর কেউ নেই। কাজের ছেলে মাদুইল্লা (মাজেদুল হক, সামসুল হকের ভাই) এসে আরও উস্কানি দেবে, 'আরও দ্যান আম্মা, আরও কয়ডা লাগান। আর যাইবনি শয়তানি কইত্তা!' মাদুইল্লা আমাকে দেখতে পারত না, আমিও তাকে দেখতে পারতাম না, সে আরেক গল্প।

শওকত আসছে না। ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর জন্যে। ওকে কি বেঁধে রেখেছে? মারছে? তাহলে ওর আব্বাকে খবর দিতে হবে।

বসেই রইলাম।

মাথার মাত্র কয়েক গজ ওপরে এসে বসল একটা দোয়েল। শিস দিতে লাগল। এত

কাছে, ইচ্ছে করলেই ফেলে দিতে পারি। কিন্তু মারলাম না। শওকতের জন্যে খারাপ হয়ে আছে মনটা। অপরাধী লাগছে নিজেকে। যদিও জানি, আমার তেমন কোন দোষ ছিল না। তরমুজ চুরি করার ভাবনাটা প্রথম ওর মাথাতেই এসেছিল।

এই সময় সেখানে এসে হাজির আমার বন্ধু কামাল। আমাকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি রে রকিব্বা, ইয়ানে কি করস?'

'কিছু না,' জবাব দিলাম।

এই দুপুর বেলা কোন কাজ নেই ওরও। সময় কাটে না। তাই বেরিয়ে পড়েছে। আমার সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করল। লাভ হলো না। আমার তখন মনমেজাজ ভাল না। জমাতে না পেরে শেষে উঠে চলে গেল সে।

আরও প্রায় আধ ঘন্টা পরে আসতে দেখলাম শওকতকে। লাফিয়ে উঠে ছুটে গেলাম ওর দিকে। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি রে, এত দেরি করলি কেন? বেঁধে রেখেছিল? খুব মেরেছে?'

শওকতের মুখ মলিন। শুকনো। দাঁত বের করে হাসল। ভাল করে দেখতে লাগলাম, ওর চোখের কোণে পানি শুকিয়ে আছে কিনা, কোথায় কোথায় মেরেছে, এসব। কিছুই চোখে পড়ল না।

ও বলল, 'বেঁধে রেখেছিল।'

'তুই বলতে পারলি না তোর বাপ আনসার অ্যাডজুটেন্ট?'

'কি হত বললে?'

'ছেড়ে দিত।'

'বলেছি। ট্যাংরা তো চেনেই আমাকে। সে-ই খেজুরের ডাল দিয়ে বাড়ি মারল কয়েকটা। ওর বাপ বাজার থেকে এসে আমাকে চিনতে পেরে ছেড়ে দিয়েছে। বকাবকি করেছে ছেলেদের।' হাঁটুর নিচে পায়ের পেছন দিকে একটা বাড়ির দাগ আমাকে দেখাল সে। দুই ইঞ্চি চওড়া হয়ে ফুলে আছে।

'তোকে যে মারল একথা তোর আব্বাকে বলা দরকার।'

'কেন মেরেছে যখন জিজ্ঞেস করবে, কি জবাব দেব? শুনলে তো ধরে আরও পেটাবে। চোর চোরই।' তিক্ত হাসি হাসল শওকত। 'বাসায় এত তরমুজ গড়াগড়ি যায়, খাই না···আজ কোন ভূতে যে চেপেছিল মাথায়!'

জীবন, মৃত্যু, ভালবাসা

বাজারে যাওয়ার পথের ধারে ছিল বিশাল এক বটগাছ। গাছটা আজ আর আছে কিনা জানি না। সেই গাছে ছিল একজোড়া বাজপাখির বাসা। গাছের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রায়ই দেখতাম পাখিদুটোকে। শীতের সকালে যখন সবে কুয়াশা কেটে রোদ উঠত, তখন আরামে পালকে ঠোঁট গুঁজে দিয়ে, কিংবা গলাটাকে ছোট করে অলস ভঙ্গিতে কোন একদিকে তাকিয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে থাকত ওরা। গরমের

দুপুরে দেখতাম, বাসার পাশের ডালে পাতার ছায়ায় ঝিমাত। শরতের বিকেলে যখন বিশাল সূর্য অস্ত যেত, লালে লালে ছেয়ে যেত পশ্চিমের আকাশটা, তখন ওরা তাকিয়ে থাকত সেদিকে। প্রকৃতি দেখত কিনা কিংবা রঙ চিনত কিনা জানি না, তবে মাঝে মাঝে যেন প্রকৃতির প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা জানাতেই বিচিত্র কণ্ঠে ছাড়ত লম্বিত ডাক।

পাখি দুটোকে আমার ভাল লাগত। তাই ওই পথ দিয়ে গেলেই মুখ তুলে তাকাতাম বাসাটার দিকে।

একদিন আমার সামনেই পয়েন্ট টু টু রাইফেল দিয়ে গুলি করে মেয়ে পাখিটাকে মেরে ফেলল এক শিকারী। পুরুষটা তখন ছিল না। হয়তো পাশের পুকুরে মাছ শিকার করতে গিয়েছিল। মুরগির মত গলা উঁচু করে বসেছিল মেয়েটা, এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল উদাসী ভঙ্গিতে। ও জানতই না, মৃত্যু এত কাছে এসে গেছে। গুলির শব্দের পরও ওর কোন ভাবান্তর দেখলাম না। তেমনি ভঙ্গিতেই বসে রইল। ডাকল না, নড়ল না, কিচ্ছু করল না। কেবল আস্তে করে মাথাটা বসে গেল নিচের দিকে।

অকারণেই পাখিটাকে মেরে রেখে হাসতে হাসতে চলে গেল শিকারী। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরেই এল পুরুষ পাখিটা। বাসায় বসে ঠুকরে ঠুকরে তোলার চেষ্টা করতে লাগল সঙ্গিনীকে। কিছুতেই তুলতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে রইল চুপ করে। সেদিন যতক্ষণ ছিলাম, একটি বারের জন্যে বাসা ছেড়ে যেতে দেখিনি পাখিটাকে।

পরদিন সকালে উঠেই পায়ে পায়ে চলে গেলাম গাছটার কাছে। অবাক কাণ্ড! আগের দিন যে রকম করে বসে থাকতে দেখে গিয়েছিলাম পুরুষ পাখিটাকে, তেমনি বসে আছে। সেদিন প্রায় সারাটা দিনই কাটালাম বাসার কাছে। বাসা ছেড়ে নড়ল না পাখিটা। পাশের পুকুরে মাছ ঘাই মারছে, ফিরেও তাকাল না সেদিকে। কয়েকবার মেয়ে পাখিটাকে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল। লম্বা করে ডাক ছাড়ল। আমার মনে হলো, কাঁদছে।

পুরো তিনটে দিন বাসা ছেড়ে নড়ল না পাখিটা। চতুর্থ কিংবা পঞ্চম দিনে দেখলাম, ঠুকরে মরা পাখিটাকে বাসা থেকে ফেলে দিল। লাশে তখন পচন ধরেছে, পোকা ধরেছে। ফেলে দিয়ে পুকুরে গেল মাছ ধরতে।

আগ্রহ শেষ হয়ে গেল আমার। তার পরদিন থেকে আর গেলাম না।

সাত-আট দিন পরেই হবে বোধহয়, বাজারে যাওয়ার সময় কৌতূহলী হয়ে তাকালাম বাসাটার দিকে। অবাক হলাম। একলা নেই আর পুরুষটা। কোথা থেকে আরেকটা মেয়ে পাখি জোগাড় করে নিয়ে এসেছে।

আরেকটা ঘটনা। একজোড়া বেওয়ারিশ কুকুর দেখেছিলাম। খুব ভাব দুটোতে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত, রাতে কোন বাড়ির আঙিনায়, দেয়ালের পাশে, কিংবা দাঁড় করিয়ে রাখা বাস-ট্রাকের নিচে শুয়ে ঘুমাত। ডাস্টবিনের আবর্জনা ঘাঁটত, কসাইয়ের দোকানের হাড়-চামড়া যা পেত তাই খেত, মাঝে সাঝে গোশতে মুখ দিয়ে ফেলে কসাইয়ের মার খেত। একদিন তো বিরক্ত হয়ে কোপ দিয়ে একটা কুকুরের কানই আলাদা করে দিল কসাই। আরও দোষ ছিল কুকুর দুটোর। পেটের তাগিদে করত তো কাজটা, দোষ বলাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। যাই হোক, লোকের বাড়িতে চুরি করত। সুযোগ পেলেই

রান্নাঘরে ঢুকে হাঁড়িতে মুখ ঢুকিয়ে দিত। ফলে ও দুটোর ওপর প্রচণ্ড খেপা ছিল লোকে। ওরাও সেটা বুঝত। সহজে কারও সামনে পড়তে চাইত না।

একদিন, বিরক্ত হয়েই কে যেন খাবারে বিষ মাখিয়ে দিয়ে পুরুষ কুকুরটাকে মেরে ফেলল। পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসা হলো রাস্তার মোড়ে, পথের ধারের শুকনো নালায়। কুকুরটা মরার পর থেকেই তার কাছ ছাড়া হয়নি মেয়েটা, কুঁই কুঁই করে ডেকে ডেকে তোলার চেষ্টা করল। টানতে টানতে যখন লাশ নিয়ে যাওয়া হলো, পেছন পেছন গেল। লাশের পাশে বসে গা চাটল, আরও নানা ভাবে তোলার চেষ্টা করল।

প্রতিদিনই ওই পথ দিয়ে যেতে হত আমাকে। লাশটা দেখতাম। দেখতাম মেয়ে কুকুরটাকে। বসে আছে লাশের পাশে, কিংবা গা ঘেঁষে শুয়ে আছে। ফুলে যে ঢোল হয়েছে লাশটা, গন্ধ ছড়াচ্ছে, কিছুই যেন এসে যাচ্ছে না ওতে। সব চেয়ে বেশি খারাপ লাগত আমার, সন্ধ্যায় যখন করুণ গলায় ডাক ছেড়ে বিলাপ করত মাদীটা। সন্ধ্যা চিরকালই আমার কাছে বিষণ্ণ। কেন বলতে পারব না, অকারণেই মন খারাপ হয়ে যায়। কুকুরটার কান্না দেখে আমার মনে হত, বোধহয় ওরও মন ওই সময় অনেক বেশি খারাপ হয়ে যায় বলেই ওভাবে কাঁদে।

লাশে পোকা ধরল, তবু পাশ থেকে গেল না মাদীটা। খিদে পেলে গিয়ে ডাস্টবিন ঘাঁটে। তারপর এসে শুয়ে থাকে গলিত লাশের পাশে।

ধীরে ধীরে লাশটা পচে মিশে গেল মাটির সঙ্গে। কিন্তু ওই জায়গা ছেড়ে নড়ল না মাদীটা। ওখানটাতেই ওর বাসস্থান হয়ে গেল। সন্ধ্যায় তেমনি করে লম্বা লম্বা ডাক ছেড়ে বিলাপ করে। স্বাস্থ্য ভেঙে গেল, শুকিয়ে হাড় জিরজিরে হয়ে গেল।

মাস দুই পরে একদিন দেখলাম, পুরুষটা যেখানে মাটিতে মিশে গিয়েছিল, ঠিক সেইখানটাতেই মরে পড়ে আছে তার সঙ্গিনী।

আরও একটা ঘটনার কথা বলি। একটু অন্য রকম, তবু যেহেতু মৃত্যুর ব্যাপারটা জড়িত, বলেই ফেলি।

কৈশোর তখন ছেড়ে যাচ্ছে আমাকে, যৌবনে পা দিতে চলেছি, রঙ ধরতে আরম্ভ করেছে মনে। জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে, আমার সমস্ত আশা-আনন্দকে কিছুকালের জন্যে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে একদিন চিরকালের জন্যে চলে গেল আব্বা। কাঁদতে পারলাম না। স্তব্ধ, পাথর হয়ে রইলাম। জলজ্যান্ত একজন মানুষ, অফিস থেকে এসে ইলিশ মাছ দিয়ে পেট ভরে ভাত খেয়েছে, কথা বলেছে, ঠিক আধ ঘন্টা পরেই নীরব হয়ে যাবে সেই মানুষটি, কল্পনাই করতে পারিনি।

তারপর আর কি? পরদিন দুপুর বেলা কবর দিয়ে এলাম লাশ। সব কিছু অসার অর্থহীন মনে হতে লাগল। সন্ধ্যা হলো, রাত নামল। বিকেল থেকেই আকাশে মেঘ। রাতে ঝুপঝুপিয়ে নামল বৃষ্টি। আমার মনের অবস্থা তখন ভয়াবহ রকম খারাপ।

চোখের পাতা একটি বারের জন্যে এক করতে পারলাম না। ঘুরেফিরে কেবলই মনে আসতে লাগল হাজারো স্মৃতি। মনে পড়ল, বাবার আঙুল ধরে মেঠোপথ দিয়ে বাজারে যাওয়ার কথা। ফাল্গুন-চৈত্র মাসের হু-হু বাতাসে ওই পথে ধুলোর ঘূর্ণি উঠত। অসংখ্য

শিমুল গাছে লাল টকটকে ফুল ফুটে থাকত, সেগুলোতে ভিড় করত শালিক। শীতের ভোরে আলো ফোটার আগেই বিছানা ছাড়ত আব্বা। ঘরেই নামাজ পড়ে বাইরে বেরোত, প্রাতঃভ্রমণ সারতে। রেললাইনের ধার ধরে চলে যেত বহু দূরে, গাঁয়ে। যখন ফিরত, পুবের আকাশ তখন আলোয় ঝলমল। সোজা চলে আসত আমার ঘরে। আমি তখনও লেপের তলায়, একটা বালিশ পায়ের ফাঁকে আরেকটা কোলের কাছে, মাথার নিচেটা খালি। সকালে ওরকম করে ঘুমাতেই ভাল লাগত আমার। আব্বা এসে আমার পায়ের কাছটায় লেপ উঁচু করে পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিয়ে বলত, 'ওঠ ওঠ, আর কত ঘুমাবি? দুপুর যে হয়ে গেল।'

চোখ মেলেই দেখতাম হাসি হাসি একটা মুখ। আমি তাকালেই মিটিমিটি হাসিটা বাড়ত। ডান হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মাথা সামান্য কাত করে চোখের ইশারায় হাতের ঠোঙাটা দেখাত। ওই বিশেষ ইঙ্গিতের অর্থ আমার কাছে ছিল পরিষ্কার। জানতাম, ওতে কি আছে। খেজুরের গুড় দিয়ে বানানো মুড়ি কিংবা চিড়ার মোয়া। গাঁ থেকে নিয়ে এসেছে। পুরো মাথা জুড়ে চকচকে টাক, গোলগাল চেহারা, ক্লীন শেভড, চাদর জড়ানো ওই মানুষটাকে তখন মহাপুরুষ মনে হত আমার। এমনি সব মধুর স্মৃতি সে রাতে বিষণ্ণতা আর দুঃখ কেবল বাড়ালই আমার। ভোর রাতে বৃষ্টি ধরে এল। নতুন কবর। বৃষ্টিতে ভিজে ধসে পড়ল কিনা কে জানে! শেয়ালেরও উৎপাত আছে। তাই বৃষ্টিটা কমতেই বেরিয়ে পড়লাম। চলে এলাম গোরস্থানে।

তখনও অন্ধকার কাটেনি পুরোপুরি। বাতাসে পানির কণা কুয়াশার মত ঝুলছে। গোরস্থানের গেট খোলা। দারোয়ানকে দেখলাম না। বোধহয় নামাজ পড়তে গেছে। আরেকটু আলো বাড়ার অপেক্ষা করলাম। তারপর ঢুকলাম ভেতরে।

কয়েকটা কবর পেরিয়েই নতুন একটা কবর চোখে পড়ল। আব্বাকে কবর দিয়ে যাওয়ার সময় এটা দেখিনি। নিশ্চয় পরে করা হয়েছে। আকার দেখেই বোঝা যায়, শিশুর। পায়ের কাছটায় গর্ত। থমকে দাঁড়ালাম। বৃষ্টিতে ধসে পড়ে ওই গর্ত হয়নি। কাফনের কাপড় বেরিয়ে আছে। শেয়ালের কাজ, কোন সন্দেহ নেই।

তাড়াতাড়ি এগোলাম আব্বার কবরটার দিকে। ওটাতেও নতুন লাশ। শেয়ালেরা ওটাতেও হানা দিল কিনা দেখা দরকার। কিছু দূর যেতেই চোখে পড়ল কবরটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ঠিকই আছে, বৃষ্টিতেও ভাঙেনি, শেয়ালেও খোঁড়েনি।

এই সময় চোখে পড়ল, একপাশের নিচু দেয়ালের ওপর জটলা করছে কয়েকটা দাঁড়কাক। উত্তেজিত হয়ে বার বার নিচের দিকে তাকাচ্ছে আর কা কা করছে। কৌতূহল হলো। শিশুটার কথা মনে ঘুরছে আমার। এগিয়ে গেলাম।

কয়েক পা যেতে না যেতেই একটা বেজিকে ছুটে পালাতে দেখলাম। আমাকে দেখেই পালিয়েছে। বুঝলাম, কিছু একটা আছে ওখানে।

লাশটা পেতে দেরি হলো না। ফুটফুটে একটা শিশুর লাশ, বছরখানেকের বেশি বয়েস হবে না। পেটের কাছে খানিকটা জায়গার চামড়া নেই, গোল করে কেটে ফেলা হয়েছে। আমি আসার কয়েক মিনিট আগে লাশটাকে তুলেছিল শেয়ালে, মানুষ দেখে লাশ নিয়ে সরে গিয়েছিল দেয়ালের কাছে। আমি ওটার দিকে যাচ্ছি দেখে শেষে ভয় পেয়ে ফেলেই পালিয়েছে।

প্রিয়জন হারানোর ব্যথায় তখন ভারি হয়ে আছে মন। তার ওপর ওরকম একটা শিশুর লাশ! কি যে হলো আমার বলতে পারব না। ভয়-ডর-দ্বিধা কোন কিছুই থাকল না। সোজা গিয়ে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম শিশুটাকে। নিয়ে এলাম কবরের কাছে। পানি জমে ভরে গেছে গর্তটা। কাফনের কাপড় যেটুকু বেরিয়ে ছিল সেটা ধরেই টেনে বের করে আনলাম পুরোটা। কি করে কাফন পরাতে হয় জানি না। যতটা ভালভাবে সম্ভব কাপড় দিয়ে লাশটাকে জড়ালাম। ফোকরের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে আলতো করে ছেড়ে দিলাম কবরের পানিতে। মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিলাম ফোকরটা। উঠে দাঁড়ালাম। পুবের আকাশে মেঘের ফাঁকে সূর্য উঁকি দিচ্ছে তখন। প্রকৃতির ওই অপরূপ সৌন্দর্য বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারল না আমার মনে। বার বার ঘুরেফিরে একটা কথাই শুধু মনে আসতে থাকল, *এই যে জীবন, এই মৃত্যু, এত ভালবাসা, সমস্ত অর্থহীন; সব, সঅব ফাঁকা!*

ভাষা শেখার বিড়ম্বনা

পিটি আই থেকে প্রাইমারি পাস করে ফেনী পাইলট হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছি। হাই স্কুলে যাব! রোমাঞ্চকর ব্যাপার। সাংঘাতিক উত্তেজনা। তবে প্রথম দিন স্কুলে গিয়েই খবর শুনে মনটা দমে গেল। উর্দু কিংবা আরবী ভাষার যে কোন একটা শিখতেই হবে। দুজন মাওলানা স্যার আছেন। একজন পড়ান উর্দু, আরেকজন আরবী। উর্দু পড়ান ছোট হুজুর, আরবী বড় হুজুর। বয়েস আর সিনিয়রিটির কারণেই যে এই ডাকনাম হয়েছিল দুজনের তখন বুঝতাম না। ধরে নিয়েছিলাম, আরবীর চেয়ে উর্দু ছোট আর সহজ বলেই ওটা যিনি পড়াবেন স্বভাবতই তিনি ছোট হবেন।

আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো কোনটা শিখতে চাই। মুখে এসে গিয়েছিল, *কোনটাই না। আরবী কিংবা উর্দু শিখে আমার কি লাভ?* কিন্তু স্যারের সামনে সেকথা বলতে পারলাম না। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, উর্দুটাই মোটামুটি সহজ হবে। কারণ দু-একটা শব্দ তো বুঝি।

কিন্তু কত যে সহজ, ক্লাস করতে গিয়ে দুদিনেই বুঝে গেলাম।

স্কুলের সাদা ইউনিফর্মের সঙ্গে একটা জিনিস যোগ করতেই হত, টুপি। না নিলে কঠিন শাস্তি। ক্লাস শুরুর আগে জাতীয় পতাকার সামনে জাতীয় সঙ্গীত গাইবার সময় টুপি মাথায় দিতেই হত।

আরও একটা সময় ওই টুপির ব্যবহার ছিল বাধ্যতামূলক। উর্দু এবং আরবী ক্লাসে। কোন যুক্তি খুঁজে পেতাম না। জাতীয় পতাকাকে সম্মান দেখানোর সময় টুপি মাথায় দিতে আপত্তি ছিল না আমার। কিন্তু ক্লাসে কেন? আরবী আর উর্দু পড়া তো নিছক ভাষা শেখার ব্যাপার। ছোট হুজুরকে প্রশ্নটা করলাম একদিন। তিনি বললেন, ভাষার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে টুপি পরতে হয়। অনেকগুলো প্রশ্ন ভিড় করল মনে। তাহলে বাংলা শেখার সময় পরতে হয় না কেন? বাংলার প্রতি কি তাহলে সম্মান দেখানোর প্রয়োজন

নেই? ভাষার প্রতি সম্মান দেখানোই যদি উদ্দেশ্য হয় তো সেটা সব ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়ার কথা। যদি ধরি কেবল বিদেশী ভাষা হলেই পরতে হবে, এই যেমন উর্দু-আরবী শেখার সময় পরার কথা বললেন স্যার, তাহলে ইংরেজী ক্লাসেই বা নয় কেন? ওটাও তো বিদেশী ভাষা? মেলাতে পারলাম না। তালগোল পাকিয়ে গেল।

দিন দশেক পরে উর্দু শেখায় ইস্তফা দিয়ে চলে এলাম আরবীতে। কয়েকদিন ক্লাস করেই বুঝলাম, আরবী শেখাও হবে না আমার কোনদিন। ঐচ্ছিক বিষয়, ওটাতে পাস না করলেও ওপরের ক্লাসে ওঠা আটকাবে না। খামোকা খেটে মরতে যাই কেন? পড়াই ছেড়ে দিলাম।

ক্লাসে পড়া পারি না, সে জন্যে শাস্তি পেতে হয়। কেবলই মনে হতে লাগল, ক্লাসটা ফাঁকি দিতে পারলে ভাল হত। সুযোগ পেয়ে গেলাম একদিন। টিফিনের পর বিকেলের দিকে হত আরবী ক্লাস। সেদিন টিফিনে বাসায় খেতে গিয়ে ভুলে টুপি ফেলে এলাম। মাথায় টুপি নেই দেখে রেগে গিয়ে আমাকে ক্লাস থেকে বের করে দিলেন বড় হুজুর।

তারপর থেকে মাঝে মাঝেই ইচ্ছে করে টুপি নিতে ভুলে যেতে লাগলাম। আসলে সঙ্গেই থাকে, পাজামার কোমরে গুঁজে লুকিয়ে রাখি। মিথ্যে কথা বলি হুজুরকে, টুপি আনতে ভুলে গেছি।

আমার দেখাদেখি আরও কয়েকটা ছেলে ইচ্ছে করে টুপি আনতে ভুলে যেতে লাগল। শাস্তি দিয়ে দিয়ে হয়রান হয়ে গেলেন তিনি। নিজে কিছু করতে না পেরে রেগেমেগে শেষে একদিন দপ্তরীকে দিয়ে আমাদেরকে হেডস্যারের অফিসে পাঠিয়ে দিলেন। দুরুদুরু বুকে গিয়ে ঢুকলাম স্যারের ঘরে। তাঁর টেবিলে সব সময় দু-চারটে বেত রাখা থাকে।

হাতের কাজটা শেষ করে মুখ তুলে স্যার জিজ্ঞেস করলেন, 'দপ্তরী যা বলে গেল, সত্যি?'

মাথা ঝাঁকালাম।

'কেন করো একাজ?'

'আরবী পড়তে ভাল লাগে না, স্যার।'

'কেন লাগে না?'

'বুঝি না, স্যার।'

'কেন, স্যার কি বোঝাতে পারেন না?'

'তিনি চেষ্টা কম করেন না। আসলে আমার মাথায়ই ঢোকে না।'

'না ঢোকার তো কথা নয়। অন্য সাবজেক্ট তো ভালই পারো শুনেছি।'

অনেকটা সাহস পেয়ে গেছি তখন। হেডস্যারের মেজাজ ভাল। ফস করে বলে ফেললাম, 'আরবী পড়ে কি হবে, স্যার? ওটা আমার কোন কাজেই লাগবে না। আমি পড়তে চাই সাইন্স। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে আরবী ভাষা জানার প্রয়োজন নেই। সমস্ত বই-ই তো ইংরেজীতে।'

আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। কোন সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না হয়তো। শেষে বললেন, 'শোনো, একটা ভাষা শেখা থাকলে ক্ষতি নেই। যাও, মন দিয়ে

পড়ার চেষ্টা কোরো। পারবে।'

বেরোনোর জন্যে পা বাড়ালাম।

হাত তুললেন তিনি। 'দাঁড়াও। টুপি লুকিয়ে মিথ্যে কথা বলে অন্যায় করেছ। বুঝতে পারছ সেটা?'

মাথা হেঁট করে বললাম, 'পারছি, স্যার।'

বেরিয়ে এলাম হেডস্যারের ঘর থেকে। তারপর আর কোনদিন আরবী ক্লাসে দুষ্টুমি করিনি। তবে ক্লাস এইট পর্যন্ত একটা পরীক্ষায়ও পাস করতে পারিনি ওই বিষয়টায়। অবশ্য সে জন্যে আমার কোন দুঃখও নেই, ক্লাস নাইনে ওঠা আটকে থাকেনি।

আজও শুনি অনেক স্কুলেই আরবী ক্লাসে টুপি পরা বাধ্যতামূলক। কেন, সত্যিকারের জবাবটা কি কেউ দিতে পারবেন?

গাঁয়ের ছবি

আমার নানার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগরের ইব্রাহিমপুর গ্রামে। ছোটবেলায় প্রতিবছরই অন্তত দু-তিন মাস কাটত আমার ওখানে। সাধারণত বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে আমাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে ওখানে চলে যেত আম্মা। কেবল আব্বা যেতে পারত না, তার চাকরি ছিল, থেকে যেত ফেনীতে। দু-তিনটে মাস মহা আনন্দে কাটত আমার। যেন উড়তাম। পড়া নেই, লেখা নেই, স্কুল নেই, ক্লাস টিচারের বেতের বাড়ি নেই, এমন কি নানীর বকার ভয় থাকায় আম্মাও যখন তখন আমার পিঠে নারকেলের শলা ব্যবহারের সাহস পেত না। ইচ্ছে মত চলতাম, যা ইচ্ছে করতাম। কেউ বাধা দেয়ার ছিল না।

অনেক বন্ধুই ছিল আমার ইব্রাহিমপুরে, তবে দুজন ছিল একেবারে জানের জান দোস্ত। একজন আমার মামাত ভাই হাবিব, আরেকজন খালাত ভাই অলি। ছোটবেলায়ই হাবিবের মা মারা গেছেন। সে তখন দুধের শিশু। দাদীর দুধ, অর্থাৎ আমার নানীর দুধ খেয়েই শেষে বড় হয়েছে সে। মা মরা ছেলে, আহারে!—তার সম্পর্কে সবারই এরকম একটা ভাব থাকায় শাসন-টাসন বিশেষ করা হত না। ফলে কিছুটা বেয়াড়াই হয়ে গিয়েছিল সে।

আমার আর অলির মত গাছ বাওয়ার ওস্তাদ ছিল না সে। সাঁতারেও তেমন পটু নয়। তবে বুদ্ধি, বিশেষ করে দুষ্টুবুদ্ধিতে আমাদের অনেককেই ছাড়িয়ে যেত। আমি ছিলাম রোগা-পটকা, টিঙটিঙে শরীর, অলি সুঠাম দেহী, আর হাবিবটা বেঁটে। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল। পেটটা ইয়া বড়। তার আব্বা অর্থাৎ আমার বড় মামা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করতেন। হাবিবকে ক্রিমির ওষুধ খাওয়াতেন প্রায়ই, কিন্তু তার ঢোলের মত পেট ঢোলই থেকে যেত, স্বাভাবিক আর হত না। অনেকেই বলত, তার এই পেট বড় হওয়ার কারণ অতিরিক্ত মাছ খাওয়া। অনেক চেষ্টা করেও তার মাছ খাওয়া বন্ধ করা যেত না। না দিলে চুরি করে খেত। তার চুরির কায়দাটাও ছিল অভিনব। রান্নাঘরে ঢুকে কড়াই থেকে মুঠো মুঠো ভাজা মাছ তুলে হাফপ্যান্টের পকেটে ভরে দৌড়ে চলে যেত ঘরের পেছনে

কামরাঙা গাছের নিচে। তারপর বের করে মুড়মুড়িয়ে খেত, যেন বাদাম ভাজা খাচ্ছে।

অলি ছিল একেবারে শান্ত। গায়ে অসম্ভব জোর। হা-ডু-ডু খেলতে নামলে যে পক্ষে সে থাকত, সে পক্ষ জিতবেই। এ জন্যে তাকে দলে নেয়ার জন্যে অস্থির থাকত সবাই। তবে যে দলেই যাই না কেন, আমি, হাবিব, আর অলি একদলেই থাকতাম। কিছুতেই আলাদা হতাম না। ইব্রাহিমপুর গেলে ভাল-মন্দ সব কিছুতেই তিনজনে একসঙ্গে থাকতাম। ছোট মামা নামই দিয়ে ফেলেছিলেন ত্রিরত্ন।

বছরের শেষে ইব্রাহিমপুরে যাওয়াটা আমার কাছে ছিল রীতিমতো এক অ্যাডভেঞ্চার, একটা সুখ-স্বপ্নের মত। সারা বছরই দিন গুণতাম কখন আসবে সেই দিন যখন আমরা যাত্রা করব। অবশেষে আসত সেই দিন। আজকের মত তখন যাতায়াত ব্যবস্থা এত ভাল ছিল না। যেতে ট্রেন, লঞ্চ, রিকশা, নৌকা সবই লাগত। অথচ দূরত্ব খুব একটা বেশি না। জায়গায় জায়গায় থামতে থামতেই সময় লেগে যেত বেশি। রাত দশটায় ফেনী স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপতাম, রাত তিনটার দিকে গিয়ে নামতাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে। তারপর ভোরের অপেক্ষায় বসে থাকা। ছটায় ছাড়বে লঞ্চ প্রায় আড়াই মাইল দূরের গোকর্ণ ঘাট থেকে। লঞ্চে করে দেড় ঘণ্টার পথ পেরিয়ে নবীনগর। সেখান থেকে আবার রিকশায় কিংবা নৌকায় তিন মাইল গেলে ইব্রাহিমপুর।

এই যাত্রাটাও ছিল আমার কাছে ভারি রোমাঞ্চকর। ওভাবে দল বেঁধে যাওয়ার অনেক কারণ ছিল। সারা বছর আমাদের স্কুল থাকত বলে বাপের বাড়ি যাওয়াটা হয়ে উঠত না আম্মার। ওই সময়ে সুযোগ পেত। তবে সব চেয়ে বড় কারণটা ছিল মহররম। তখন আমার নানার বাড়িতে নানা-মামাদের পীর সাহেব আসতেন। বড় মাহফিল হত। ঈদের চেয়ে অনেক বেশি ধুমধামের সঙ্গে হত মহররমের মাহফিল। গরু জবাই হত, ছাগল জবাই হত। মাহফিলের সুবাদে আম্মার যত আত্মীয়-স্বজন যেখানে যারা থাকত, প্রায় সবাইই এসে হাজির হত। সবাই নানা জায়গায় কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকে। এভাবে সবার সঙ্গে সবার দেখা হয়ে যাওয়াটা একটা বিরাট ব্যাপার। এই সুযোগ কিছুতেই হারাতে চাইত না আম্মা।

আমার ছোট মামা আর আম্মা পিঠাপিঠি ভাইবোন। গলায় গলায় ভাব। একজনকে ছাড়া আরেকজন বড় কোন কাজ করার কথা ভাবতেই পারত না। আর মহররমের মাহফিল তো একটা বিরাট অনুষ্ঠান। ক্যালেণ্ডারে আর কিছু দেখি না দেখি, মহররম কবে সেটা ঠিকই দেখতাম। লাল কালিতে দাগ দিয়ে রাখতাম। পনেরো দিন আগে থেকে শুরু হত অপেক্ষার পালা, কবে ঢাকা থেকে আসে ছোট মামার চিঠি। সেই চিঠিতে একটা বিশেষ কথাই লেখা থাকত ঃ অমুক দিন আমরা (মামার পরিবার) রওনা হচ্ছি।

একই দিনে আমরা রওনা হতাম ফেনী থেকে, মামারা রওনা হতেন ঢাকা থেকে। আমাদের ট্রেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আগে পৌঁছত। নভেম্বরের শেষ কিংবা ডিসেম্বরের প্রথম পড়ত তখন। প্রচণ্ড শীত। ট্রেন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিথর হয়ে যেত স্টেশন। মিটমিট করত ল্যাম্পপোস্টের বৈদ্যুতিক আলোগুলো, যেন ঘুমকাতুরে স্টেশনটার চোখ ওগুলো। এখনকার মত তখন এত মানুষ ছিল না, স্টেশনেও বাস্তুহারাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। বড় জোর একআধজনকে দেখতাম, ওয়েইটিং রুমের বারান্দায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে

ঘুমাচ্ছে। কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে স্টেশনটাও যেন ঘুমিয়ে যেত। তবে অত রাতেও প্রাণ চঞ্চল থাকত টিকেট কাউন্টারের সামনের ছাউনিটা। বড় বড় দুটো চা স্টল ছিল ওখানে। যাত্রী, কুলি, স্টেশনের কর্মচারী সবারই ভিড় ছিল ওখানে।

আব্বা আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারত না, তাই গ্রাম থেকে বড় মামা আসতেন নিতে। তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম আমি। যেখানে যেতেন সেখানেই যেতাম। কাপের পর কাপ চা খেতেন। আমাকে কিনে দিতেন টোস্ট, কেক, আর বড় বড় গোল সাদা বিস্কুট।

ঢাকার দিক থেকে ট্রেন আসার ঘণ্টা পড়ত। মুহূর্তে জেগে উঠত স্টেশন। কাঁথা কিংবা চাদরের নিচ থেকে লাফিয়ে উঠে বসত কুলিরা। ছুটে যেত প্ল্যাটফর্মে। লটবহর নিয়ে যাত্রীরা তাড়াহুড়ো করে বেরোত। আমি একছুটে ওয়েইটিং রুমে গিয়ে ট্রেন আসার, অর্থাৎ মামাদের আসার সুখবরটা আম্মা আর বোনদের কাছে ঘোষণা করে দিয়েই এসে বড় মামার হাত ধরতাম। বেরিয়ে আসতাম প্ল্যাটফর্মে। দূরে রেলপথের বাঁকের কাছে দেখা যেত হেডলাইট। প্রথমে একটা বিন্দুর মত, দ্রুত বড় হত সেটা, দেখতে দেখতে চলে আসত কাছে।

ট্রাংক-স্যুটকেস-বেডিং নিয়ে নামতেন মামা, সঙ্গে আমার মামী আর মামাত ভাইবোনেরা। অহেতুক কথার ফুলঝুরি ছোটাতাম তাদের সঙ্গে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতাম ওয়েইটিং রুমে, যেখান আম্মা আর আমার বোনেরা আছে। মালপত্র আর কুলির দায়িত্ব নিতেন বড় মামা।

তখনও ভোর হতে প্রায় এক ঘণ্টা দেরি।

আস্তে আস্তে ফর্সা হত পুবের আকাশ। রিকশা আর কুলি আগেই ঠিক করে রাখতেন বড় মামা। হাঁকডাক করে সবাইকে নিয়ে গিয়ে তুলতেন রিকশায়।

ছোট্ট শহর। পাঁচ মিনিটেই বেরিয়ে চলে আসতাম শহরের বাইরে, তার পর থেকেই গ্রাম। দুধারে খাল, তার ওপাশে খেত। আলো বাড়ত। ফসল কেটে ফেলা রুক্ষ খেত, ঘোলা পানির খাল, কুয়াশা, শীত, সব কিছুকেই লাগত অপূর্ব। মনে হত, এত সুন্দর বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

আরও আলো বাড়ত। দিগন্তে কালো হয়ে থাকা গ্রামের গাছপালার মাথায় দেখা দিত সূর্য। সোনালি মোলায়েম আলোর বর্শাগুলো ছুটে এসে আরামের পরশ বোলাত শরীরে। ততক্ষণে বেরিয়ে পড়ত পাখির দল। খালের পাড়ে কিংবা পানিতে কচুরিপানার ওপরে এসে বসত কানি বক, খেতের মধ্যে পড়ে থাকা ধানের লোভে নামত ঘুঘু আর পায়রার ঝাঁক, শুকনো আলে মারামারি বাধাত শালিক। এই সব অপরূপ দৃশ্যের মাঝে অনেকটা দৃষ্টিকটুই দেখাত আরেকটা বিশেষ দৃশ্য। অশ্লীলই বলা চলে। ওই বয়েসে অবশ্য খুবই মজা পেতাম। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে রাস্তার ধারের ঢালু জায়গায় লুঙ্গি তুলে নির্দ্বিধায় বসে যেত কিছু নির্লজ্জ, বেহায়া মানুষ। রাস্তার কয়েক গজের মধ্যেই। মাথাটা নিচু করে হাস্যকর একটা ভঙ্গি করে থাকত। ভাবখানা এমন, যেহেতু সে কারও দিকে তাকাচ্ছে না, অন্যেরাও তাকে দেখতে পাচ্ছে না। কাকের অবস্থা আরকি। মুরগীর বাচ্চা ধরে নিয়ে গিয়ে পরে খাবে বলে খড়ের চালায় লুকিয়ে রাখে কাক। লুকানোর সময়

নিজের চোখ বন্ধ করে রাখে। তার ধারণা, সে অন্ধ হয়ে আছে বলে বাকি সবাইও তার মতই অন্ধ, দেখতে পাচ্ছে না। না দেখে লুকায়, ফলে পরে এসে নিজেই আর খুঁজে পায় না কোথায় রেখেছে। কাককে এই কাণ্ড করতে আমি বহুবার দেখেছি। ইদানীং আমাদের সমাজের অনেক বড় বড় মানুষ আর রাজনীতিবিদের কাণ্ড দেখে আমার সেই কাকের কথাই মনে হয়।

ফুড়ুৎ করে যেন শেষ হয়ে যেত রিকশার পথটা। দেখা যেত, ঘাটে লঞ্চ বাঁধা রয়েছে। সব কিছুকেই বড় আপন মনে হত তখন। নীলচে সাদা বড় লঞ্চটাকেও মনে হত আমার পরম আত্মীয়। ডেকে উঠে রেলিঙে হাত বোলাতাম, মনে হত প্রাণভরে আদর করি। নিচে কালো পানি মৃদু ছলছল করে বাড়ি মারে লঞ্চের গায়ে। শহুরে যাত্রীদের দেখে জেলে নৌকা এসে ভিড় করত লঞ্চের পাশে। নৌকার খোলে তাজা মাছ। রাতে ধরেছে। বিক্রি করত যাত্রীদের কাছে। খানিক দূরে বালির তীরে ছিল অনেকগুলো চায়ের দোকান, বাঁশের বেড়া, টিনের চাল। ডিম ভাজা আর পরোটার গন্ধ আসত নাকে। বাসায় যে জিনিস খেতে চাইতাম না বলে আম্মার পিটুনি পর্যন্ত খেয়েছি, ওই পরিবেশে সেটাই মনে হত সাংঘাতিক লোভনীয় খাবার।

সারেঙ এসে ঢুকত কেবিনে। সঙ্কেতের দড়ি টানতেই টিংটিং করে ঘন্টা বাজত ইঞ্জিন রুমে। গুঞ্জন তুলে চালু হয়ে যেত ইঞ্জিন। থরথর করে কেঁপে উঠত লঞ্চের সমস্ত শরীর। আমিও কেঁপে উঠতাম, আনন্দে, উত্তেজনায়। প্রতিটি সাধারণ শব্দকেও মনে হত অনেক বেশি আকর্ষণীয়, অনেক বেশি মধুর।

লঞ্চ ছাড়ত। একটা মুহূর্তের জন্যেও ডেক থেকে সরতাম না। চওড়া খালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বড় নদীতে পড়ত লঞ্চ। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম দু-তীরের দিকে। কাঁচা রোদে ছবির মত দেখাত গ্রামগুলো। কলসি কাঁখে দল বেঁধে ঘাটে আসত কিষাণী বধূ। খেতে লাঙল দিত চাষী। লাঙলের ফলার সঙ্গে সঙ্গে নির্ভয়ে ঘুরত শালিক আর এক ধরনের সাদা বক, পোকার লোভে। নদীর মাঝে মাঝে ভেসে যেত কচুরীপানার দঙ্গল। সেগুলোতে থাকত নানা ধরনের বক। পানকৌড়ি আর মাছরাঙারা বসে থাকত অল্প পানিতে গেড়ে রাখা বাঁশের খুঁটিতে।

লঞ্চ চলত, তার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমিও চলতাম। পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে এক রূপকথার রাজ্যে যেন বিচরণ করতাম তখন। ঘাটে ঘাটে লঞ্চ থামত, যাত্রী উঠত। তারপর আবার চলার পালা। মাঝেসাঝে উল্টো দিক থেকে আসা দুয়েকটা লঞ্চ চিমনির কালো ধোঁয়া উড়িয়ে পাশ কাটাত। নৌকা ছিল অগুণতি। নানা রকমের, নানা আকারের। ছোট জেলে ডিঙি থেকে শুরু করে বিশাল বিশাল পাটের নৌকা।

লঞ্চযাত্রাও শেষ হত এক সময়। নবীনগরের ঘাটে ভিড়ত লঞ্চ। সামনের গলুইয়ের কাছটায় দাঁড়িয়ে ঘাটের একটা বিশেষ কোণের দিকে উৎসুক চোখ বোলাতাম। জানতাম, ওরা ওখানটাতেই থাকবে। আমাকে নিরাশ হতে হত না। সত্যিই থাকত ওরা। বাড়ির কাজের লোকদের নিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আসত আমার চেয়ে অনেক বড় মামাত-খালাত ভাইয়েরা। কখনও কখনও হাবিব আর অলিও থাকত তাদের সঙ্গে।

লঞ্চ থেকে নেমে নৌকা কিংবা রিকশা। ঘন্টাখানেক লাগত বাড়িতে পৌঁছতে।

সেখানে এক বিরাট সম্বর্ধনা অপেক্ষা করত আমাদের জন্যে। আমার জন্যে অপেক্ষা করত অসংখ্য অ্যাডভেঞ্চার আর আনন্দ।

যে উদ্দেশ্যে আমাদের যাওয়া হত ইব্রাহিমপুরে, সেই মহররমের মাহফিলের কথা কিছু বলি এবার।

পীর সাহেব আসতেন মহাসমারোহে, মহাআড়ম্বরে। অনেক মুরিদ পরিবেষ্টিত হয়ে। ঢাকা থেকে সদলবলে আসতেন তিনি। লঞ্চ থেকে নামতেন নবীনগরে। তারপর নৌকা। তটস্থ হয়ে থাকত সারাবাড়ি, তটস্থ থাকতাম আমরা। এমন একটা ধারণা হয়ে যেত আমাদের, যেন পান থেকে চুন খসলেই মহাসর্বনাশ হয়ে যাবে। পীর সাহেবকে সবাই ডাকতেন হুজুর বলে। স্বভাবতই আমিও ডাকতাম হুজুর। অবশ্য আমার ডাকা না ডাকাতে তাঁর কিছু এসে যেত না। অনেক বড় বড় মানুষ তাঁর পদতলে গড়াগড়ি করতে পারলে ধন্য হয়ে যেতেন, আমি তো অতি নগণ্য এক কিশোর।

তিনি আসতেন মহররমের তিন-চারদিন আগে। বাড়িঘর পরিষ্কার করে ঝকঝকে করে ফেলা হত। বৈঠকঘরে ফরাস পাতা। একধারে চৌকিতে নরম বিছানা। নিচের ফরাসে গদি পেতে আরেক বিছানা, তাতে নরম বালিশে ঠেস দিয়ে বসতেন হুজুর। চেহারাটা সত্যিই দেখার মত ছিল তাঁর। টকটকে গোরা রঙ, বড় বড় চোখ, চাপদাড়ি, মাথায় কিস্তি টুপি। সারাক্ষণ পান খেতেন, লাল হয়ে থাকত জিভ আর ঠোঁট। ফলে হাসিটাও ছিল চমৎকার। বাংলাদেশের মানুষ নন। শুনেছি ভারতের বিহার থেকে এসেছিলেন তাঁর পিতা। দীর্ঘদিন এদেশে থেকে থেকে চমৎকার বাংলা বলা শিখে গিয়েছিলেন হুজুর। আরেকটা সাংঘাতিক ক্ষমতা ছিল তাঁর—যে কোন মানুষের সঙ্গে একবার কথা বললেই তার চেহারা মনে থেকে যেত, কোন দিন ভুলতেন না আর। নামধাম কিছুই ভুলতেন না। তবে এসব ব্যাপার অবাক লাগত না আমার। ভাবতাম, এতবড় কামেল লোক, মনে তো থাকবেই, তাঁর জন্যে এটা কোন ব্যাপারই নয়।

হুজুর বাড়ির সীমানায় ঢোকার সময় হুড়াহুড়ি পড়ে যেত সবার মধ্যে। সবাই কেমন শঙ্কিত। বহুবার দেখা আছে, তারপরেও হুজুরকে একনজর দেখার জন্যে বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে থাকত মেয়েরা।

খুব জমজমাট হয়ে উঠত সেদিন মাগরিবের নামাজের জামাত। অনেকগুলো হ্যাজাক জ্বালানো হত। সাদা আলোর বন্যায় ভেসে যেত বৈঠকঘর আর তার আশপাশটা। নামাজের পর বসত চায়ের আসর। সেই সঙ্গে জমজমাট আলোচনা। ধর্মীয় আলোচনা থেকে শুরু করে রাজনীতি, কোনটাই বাদ যেত না।

এশার নামাজের পর খাওয়া-দাওয়া। সে এক এলাহি কাণ্ড। একেবারে জমিদারি ভোজ। দামী দামী খাবারে ভরে যেত হুজুরের গদির সামনের অনেকখানি জায়গা। গাঁয়ে যত মুরিদ ছিল তাঁর, সবাই হুজুরকে তাদের সব চেয়ে ভাল খাবারটা দেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে থাকত। হুজুর যদি দয়া করে একটু মুখে দিতেন, ধন্য মনে করত নিজেদের। কারও বাড়িতে হয়তো নতুন কলাগাছ লাগানো হয়েছে, সব চেয়ে ভাল কাঁদিটা রেখে দেয়া হত হুজুরের জন্যে। মুরগী প্রথম ডিম পেড়েছে? সেটাও হুজুরের। ফল গাছে নতুন ফল হয়েছে? হুজুরকে আগে না খাইয়ে মুখে দেবে না মুরিদ। ব্যাপারটার মধ্যে কোন রকম জোরাজুরি ছিল না। আন্তরিক ভাবেই কাজটা করত মুরিদ। হুজুরকে দিয়ে আনন্দ পেত

বলেই দিত।

খাবারের বেলায় আরেকটা নিয়ম চালু ছিল, যেটা আমাকে খুব পীড়া দিত। এত ভাল ভাল খাবার তৈরি হত, কিন্তু মরে গেলেও তার থেকে একটু দেয়া হত না আমাদের। আগে হুজুর খাবেন, সঙ্গে আসা মেহমানরা খাবেন, তারপর কিছু বাঁচলে আমাদের, মানে বাড়িতে যারা থাকতাম, তাদের ভাগ্যে জুটবে।

খাবারের ব্যবস্থা যেমন জমিদারি, খাওয়া শুরুও হত তেমনি জমিদারি কায়দাতেই। ফরাসে সারি দিয়ে গোল হয়ে বসে যেত সবাই। সামনে বাসন দেয়া হত। কয়েকজনে মিলে খাবার বেড়ে বেড়ে দিত সবার পাতে। দুই ভাগে পরিবেশন করা হত খাবার। প্রতিটি ভাল খাবারই আগে ডেকচি থেকে হুজুরের জন্যে নির্দিষ্ট বিশেষ পাত্রে তুলে নেয়া হত। তারপর আরেক পাত্রে নেয়া হত সাধারণ মানুষের জন্যে। হুজুরের বাসন-পেয়ালা-গেলাস সব আলাদা। তাতে অন্য কারও খাওয়ার নিয়ম নেই। কেন নেই? জিজ্ঞেস করে সদুত্তর পেতাম না। নানী আর আম্মা জবাব দিত, ক্ষতি হবে। কি ক্ষতি হবে? বলতে পারত না। প্রচণ্ড কৌতূহল দমাতে না পেরে চুরি করে হুজুরের গেলাস দিয়ে ইচ্ছে করেই পানি খেয়ে ফেলেছিলাম আমি। কোন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে পড়ে না। কিংবা এমনও হতে পারে, তিনি অলৌকিক ক্ষমতা বলে ব্যাপারটা দেখে ফেলেছিলেন (বয়স্কদের মুখে শুনতাম, এই ক্ষমতা নাকি ছিল তাঁর), ছোট্ট একটা দুষ্টু ছেলের কাণ্ড দেখে মুচকি হেসেছিলেন, অপরাধটা তার মাপ করে দিয়েছিলেন বলেই ছেলেটার, অর্থাৎ আমার কিছু হয়নি।

সব মানুষেরই কিছু প্রিয় মানুষ থাকে। হুজুরেরও ছিল। খেতে বসে নিজের পেয়ালা কিংবা পাত থেকে খাবার তুলে নিয়ে তাদেরকে দিতেন হুজুর। খাওয়া-দাওয়ার ওই অংশটা খুব ভাল লাগত অনেকের। মহিলা মহলের প্রায় সবাই বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে এটা উপভোগ করতেন। কিন্তু আমার ভাল লাগত না। বড় বড় মানুষেরা, যাদেরকে ভয় করতাম, সম্মান করতাম, তারা এমন সব কাণ্ড শুরু করত, বিস্ময়ে থ হয়ে যেতাম। মুরিদদেরকে খাবার দেয়ার একটা বিশেষ কায়দা ছিল হুজুরের। মাংসের টুকরো কিংবা মিষ্টি আলগোছে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিতেন যাকে দিতে চান তার পাত লক্ষ্য করে। মাঝে মাঝে আবার আস্ত এক পাতিল দই কিংবা এক হাঁড়ি মিষ্টি দিয়ে দিতেন একজনকে। তার অলক্ষ্যে অন্যদেরকে ইশারা করতেন কেড়ে নেয়ার জন্যে। ব্যস, শুরু হয়ে যেত হুড়াহুড়ি। মাটির হাঁড়ি ভেঙে গড়াগড়ি যেত, বিছানায় ছড়িয়ে যেত দই বা মিষ্টি। ওখান থেকেই তুলে নিয়ে খেয়ে ফেলত মুরিদরা। চোখের পলকে শেষ হয়ে যেত খাবারটা। দই হলে হাতে, মুখে, চোখে লেগে যেত অনেকের। সেখান থেকে এনেই চেটেপুটে খেয়ে ফেলত তারা। অসামান্য ভক্তি মুরিদদের। তাদের বিশ্বাস, হুজুরের দেয়া জিনিস মানেই তবররুক, সাংঘাতিক পবিত্র জিনিস। এক ফোঁটাও ফেলা যাবে না। মাহফিলের জন্যে তবররুক হিসেবে ব্যবহার হত সাধারণত ঘন করে জ্বাল দেয়া খাঁটি দুধের তৈরি ফিরনি। সেই জিনিস যে তস্তরিতে বা পেয়ালায় দেয়া হত, খাবার পর সেই তস্তরি বা পেয়ালা ধুয়ে পানিটাও খেয়ে ফেলা হত।

হুজুরের প্রতি যে কি অসামান্য ভক্তি থাকে কোন কোন মুরিদের, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। আমার এক নানা, অর্থাৎ আম্মার ছোট চাচাও ছিলেন পীর। বিভিন্ন

জায়গায় তাঁর মুরিদ ছিল। মেঘনার চরেও ছিল। এইচ এস সি পরীক্ষা দিয়ে হাতে দু-তিনমাস কোন কাজ ছিল না। নানার সঙ্গে গিয়েছিলাম চরাঞ্চলের সেই সব মুরিদদের বাড়িতে বেড়াতে। এভাবে মুরিদের বাড়ি পরিদর্শন করাকে বলা হত *সফর* । বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। সেখানে এক বাড়িতে অবস্থান করছেন তখন নানা। তাঁর অনেক বয়েস তখন, একটা দাঁতও নেই। দু-পাটি দাঁতই বাঁধানো। খাওয়ার পর সেগুলো খুলে নিয়ে ধুয়ে আবার পরতেন। এক দিন দুপুরে খাওয়ার পর যে বাসনে খেয়েছেন সেই এঁটো বাসনেই দাঁতগুলো নিয়ে ধুয়ে নিয়ে পরলেন। একজন মুরিদকে বললেন বাসনের পানিটা ফেলে দিতে। লোকটা করল কি, দুহাতে বাসনটা তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলতে লাগল সেই এঁটো হাত আর দাঁত ধোয়া, কফ মেশানো পানি। ধমক দিলেন নানা। শুনল না। পুরোটা খেয়ে ফেলল। ভরপেট খেয়েছি তখন আমি। সহ্য করতে পারলাম না। মোচড় দিয়ে উঠল পেট। এক লাফে উঠে সোজা ছুটে চলে গেলাম বাইরে। হড়হড় করে গলা দিয়ে ঠেলে উঠে এল সব। অসুস্থই হয়ে পড়লাম। যে কাণ্ড করল লোকটা, কথাটা হয়তো অনেকেরই বিশ্বাস হতে চাইবে না। নিজের চোখে না দেখলে আমারও হত না।

যাই হোক, হুলস্থুল করে খাওয়ার পালা সাঙ্গ হত। তারপর বসত কাওয়ালির আসর। ঢাকা থেকেই সঙ্গে করে স্পেশাল কাওয়াল-দল নিয়ে যেতেন হুজুর। বাঁয়া-তবলা-হারমুনিয়ম বাজিয়ে শুরু হত কাওয়ালি। অনেক রাত পর্যন্ত চলত। কখনও কখনও একটা, দুটো, তিনটেও বেজে যেত। কাওয়ালি শুনতে শুনতে একেক সময় ভাব এতটাই তুঙ্গে উঠে যেত কারও কারও, স্থির হয়ে বসে থাকতে পারত না। ভাবের তালে উঠে রীতিমতো নাচতে আরম্ভ করত তারা, হুঁশ থাকত না।

কাওয়ালি শেষ হলে সেদিনকার মত ভাঙত আসর। ঘুমাতে যেতেন হুজুর আর তাঁর সঙ্গে আসা মেহমানেরা। কিন্তু বাড়ি নীরব হত না। বিশেষ করে রান্নাঘর। সেখানে তখন নাস্তা বানানোর তুমুল আয়োজন। অনেক মানুষের নাস্তা। সকাল হলেই হুজুর আর মেহমানদের সামনে দিতে হবে।

এমনি করেই মহা ধুমধামের সঙ্গে কেটে যেত সাত-আটটা দিন। হুজুর যে কদিন বাড়িতে থাকতেন, সর্বক্ষণ গরম হয়ে থাকত বাড়ি। গমগম করত। অন্যদের কেমন লাগত জানি না, তবে শোয়া, ঘুম আর খাওয়ার কোন ঠিকঠিকানা থাকত না বলে মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগত আমার। তা লাগলেই বা কি। আমাকে নিয়ে আর তখন কে মাথা ঘামায়। আম্মাও আর সব মহিলাদের মত রান্নাঘরেই ব্যস্ত থাকত। হুজুর এলেই বাড়ির লোকগুলো কেমন যেন অস্থির আর সন্ত্রস্ত হয়ে যেত। বদলে যেত আচরণ। আমার ছোটমামা—বুদ্ধিমান, স্থির মস্তিষ্ক বলে যাকে জানত সবাই, অনেক জটিল ব্যাপারেও পরামর্শ নিতে আসত, সেই তিনিও কেমন যেন অন্য রকম হয়ে যেতেন। কিছুটা খেপা। চেঁচিয়ে, ধমক দিয়ে অস্থির করে তুলতেন সবাইকে। অচেনা মনে হত তাঁকে। এমন সব আচরণ করে বসতেন, যেটা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ।

মহা ধুমধাম করে মহররমের মাহফিল শেষ হত। গরু জবাই করে খিচুড়ি খাওয়া হত। সেই সঙ্গে তেঁতুলের চাটনি। একবার খিচুড়ির পরিবর্তে ঢাকা থেকে অর্ডার দিয়ে

বানিয়ে হাজার হাজার তন্দুরি রুটি নিয়ে গিয়েছিলেন মামা। তবররুক হিসেবে থাকত শরবত। কলসে কলসে। যার যত ইচ্ছে নিয়ে খাও, মানা নেই। তবে ফেলা চলবে না এক ফোঁটাও। পেস্তা-বাদাম দিয়ে তৈরি সে শরবতের স্বাদ সত্যিই ছিল অসাধারণ।

তারপর একদিন সবাইকে বিষণ্ন করে, বাড়ি ফাঁকা করে বিদায় নিতেন হুজুর।

ওই ইব্রাহিমপুরের অসংখ্য স্মৃতি গেঁথে রয়েছে আমার মনে। যা মোছে না, মুছবেও না কোনদিন। বিরাট এক পুকুর ছিল বাড়ির সামনে। দুই পাড়ে বাঁশ আর অন্যান্য গাছের জঙ্গল। অন্য যে দুই পাড়ে বাড়িঘর ছিল, সেগুলোরও বেশির ভাগ এত বেশি গাছপালায় ছাওয়া, জঙ্গলই মনে হত। এক কোণে জঙ্গল এত ঘন ছিল, দিনের বেলাতেও প্রায় অন্ধকার থাকত। ভয়ে সেদিকটায় পারত পক্ষে যেতে চাইত না লোকে। বিশেষ করে সাপের ভয়ে। আর আমার বয়েসীদের জন্যে সাপের ভয় তো ছিলই, ভূতের ভয়ও ছিল। আমি অবশ্য কোন কালেই ভূতপ্রেতকে খুব একটা পরোয়া করতাম না। মাঝে মাঝে শ্যাওড়া গাছ আর তেঁতুল গাছের মগডালে উঠে যেতাম ভূত আবিষ্কারের জন্যে। নানী বলত, ওসব গাছেই নাকি ভূতপেত্নী থাকে বেশি।

কোণের ঘন জঙ্গলটার প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল খুব। কারণ যত রাজ্যের পাখির বাসা ওখানে। গুলতি দিয়ে পাখি মারা যেত। নানা রকম প্রজাপতি আর ফড়িঙ ধরা যেত। ফড়িঙ ধরতাম একটা বিশেষ কায়দায়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে হু-হু বাতাসে ঢেলা খেতের ধুলো উড়ত, বনের গাছপালার মাথা দুলিয়ে ক্রমাগত বয়ে যেত দামাল হাওয়া। হাজার হাজার ফড়িঙ উড়ত তখন বাতাসে। কত রঙের আর কত রকমের ফড়িঙ যে ছিল! লম্বা পাটখড়ির মাথায় এক ধরনের গাছের ঘন আঠা পুরু করে লাগিয়ে নিয়ে ফড়িঙগুলোর মাঝে নাড়তাম। আঠায় পাখা আটকে যেত ফড়িঙের। কায়দাটা আমার নিজের আবিষ্কার। আব্বাকে পাখি ধরতে দেখে শিখেছিলাম। চার টুকরো বাঁশের কাঠিকে আড়াআড়ি বেঁধে তাতে ওই আঠা মাখিয়ে দিত আব্বা। এমন ভাবে বাঁধা হত কাঠিগুলো, চারটে পা তৈরি হত, দাঁড় করিয়ে রাখা যেত। চারটে কাঠিই যেখানে একজায়গায় মিলিত হয়, সেখানটায় তেলাপোকা বেঁধে দিত। এরকম অনেকগুলো ফাঁদ তৈরি করে নিয়ে গিয়ে রাখত বাড়ির কাছেরই ছোট্ট একচিলতে জমির একধারে। ছোট একটা বাঁশঝাড় ছিল সেখানে। দোয়েল, শ্যামা আর শালিকের ভিড় ছিল তাতে। তেলাপোকা খাওয়ার লোভে পাখি এসে বসত ফাঁদের কাঠিতে, পা আটকে যেত আঠায়। ভয় পেয়ে উড়ে যাওয়ার জন্যে যতই ছটফট করত, ডানাও যেত জড়িয়ে। ধরা পড়ত। পাখিগুলোকে অবশ্য কিছু করত না আব্বা। ধরে আঠা থেকে ছাড়িয়ে ছেড়ে দিত। এটা ছিল তার কাছে মজার একটা খেলা। আসলে সময় কাটানোর আর কিছু পেত না তো, কিছু একটা করে সময় কাটাত। এই পাখি ধরার ব্যাপারটা আমার ভীষণ ভাল লাগত, সাংঘাতিক উত্তেজনা। পাখি ধরা দেখেই মাথায় এসেছিল বুদ্ধিটা—আঠা যদি পাখিকে আটকে ফেলতে পারে, ফড়িঙকে পারবে না কেন?

কোণের জঙ্গলে আরেকটা আকর্ষণ ছিল আমার, পাখির ডিম। গাছে গাছে টিয়ার বাসা। গাছের গায়ে খোড়ল করে বাসা বানায় টিয়া। গাছে চড়তে জানলে ওই ডিম নামানো কিছুই না। তবে মারাত্মক বিপদের আশঙ্কাও থাকত এতে। ডিমের প্রতি সাপেরও বেজায় লোভ। বাসায় ঢুকে পাখির ডিম খেয়ে ফেলত। ওই জঙ্গলে গিয়ে নজর

রাখলে এই দৃশ্য দেখাটা এমন কোন দুর্লভ ব্যাপার ছিল না। পাখির ডিম চুরি করতে গিয়ে একদিন যে কি সাংঘাতিক বিপদে পড়েছিলাম, সেই গল্প বলি।

ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। খেয়েদেয়ে বড়রা শুয়ে পড়েছে। হাবিব আর অলি গেছে স্কুলে। আমি একা। কিছুই করার নেই। কামরাঙা গাছের নিচে বসে রঙ পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকার চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ। ভাল লাগল না। সময় আর কাটে না। শেষে দুত্তোর বলে উঠে পড়লাম। গুলতি নিয়ে চললাম কোণের বনে।

অনেক বড় একটা গাছের নিচে এসে দাঁড়ালাম। কি গাছ ঠিক মনে নেই। সম্ভবত পিত্তশূল (আঞ্চলিক নাম) গাছ হবে। ওটাতে অনেকগুলো টিয়ার বাসা। উঠে পড়লাম। একটা বাসার কাছে এসে থামলাম। খোড়লে হাত ঢোকানোর আগে শিওর হওয়া দরকার, ভেতরে সাপ-বিচ্ছু কিছু আছে কিনা। গুলতির ডাঁটি দিয়ে জোরে জোরে কয়েকটা বাড়ি মারলাম খোড়লের সামান্য নিচে গাছের গায়ে, বাসাটা যেখানে থাকার কথা। কর্কশ চিৎকার করে বেরিয়ে গেল একটা টিয়া। তার মানে সাপ-টাপ নেই। হাত ঢুকিয়ে দিলাম। আছে। ডিম। দু-আঙুলে আলতো করে ধরে বের করে আনলাম দুটো ডিম। হাতের তালুতে নিয়ে ভাল করে দেখলাম। তারপর আবার রেখে দিলাম বাসায়। পরে নামার সময় নিয়ে যাব।

এত তাড়াতাড়ি ফেরার ইচ্ছে নেই। গিয়ে কি করব? খেলার সাথী কেউ নেই। তার চেয়ে বরং একলাই গাছে বসে থাকব। একলা একলা এভাবে গাছে বসে থাকতে ভাল লাগত আমার। অনেক উঁচু গাছ। চারপাশের বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে।

চড়ে বসলাম ওপর দিকের একটা মোটা ডালে। তিন দিকে খেত, ফসল কাটা অনেক আগেই শেষ। ধবধবে সাদা ঢেলা-জমি এখন। মাতাল বাতাসে থেকে থেকে তাতে উড়ছে ধুলোর ঘূর্ণি। পশ্চিমে নবীনগর যাওয়ার কাঁচা সড়ক। পুব আর উত্তরে বিল। সেখানে ঝাঁকি জাল আর পলো দিয়ে মাছ ধরছে অনেক লোক। বক উড়ছে মাছের লোভে। একটা দুটো নয়, শত শত। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ শীতের পাখি আসত তখন ওসব অঞ্চলে। এখনও আসে, তবে অনেক কমে গেছে। নানা রকমের হাঁস, বক আর অন্যান্য জলচর পাখিতে ছেয়ে থাকত বিল।

হঠাৎ আমার আশেপাশে কলরব করে উঠল কয়েকটা শালিক। নিশ্চয় শেয়াল-টেয়াল কিছু দেখেছে। বেজি আর গুঁইসাপ দেখলেও ওরকম চেঁচায় পাখিগুলো। কারণ ওই দুটো জীবও ডিম খায়।

নিচে তাকিয়ে দেখলাম, একটা শেয়াল। গর্ত থেকে বেরিয়ে অলস ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে খেতের দিকে।

'হেই শেয়াল, হেই!' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম।

চোখের পলকে আবার গর্তে গিয়ে সেঁধোল শেয়ালটা।

আবার নীরব হয়ে গেল বন। দুরন্ত বাতাসে দোলে গাছের ডাল। সেই সঙ্গে আমিও দুলছি। দারুণ লাগছে। ভাবতে লাগলাম, যেন দূর আফ্রিকার বনে রয়েছি আমি। বনের রাজা টারজান। হরিণ মেরে খেয়েছি, বিশ্রাম নিচ্ছি এখন গাছে বসে। আরেকটু পরেই বেরোবো দুর্গম সোনার দেশের সন্ধানে।

চোখ রয়েছে বিলের দিকে, কিন্তু মন চলে গেছে আমার আফ্রিকায়। একটা বেয়াদব সিংহকে খতম করে দিয়ে রহস্যময় স্বর্ণনগরীতে ঢুকলাম। চাঁদের আলোয় নগরীর ছায়াঢাকা নির্জন পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ আমার দিবা-স্বপ্ন ভঙ্গ করল আবার শালিকের দল। আগের চেয়ে জোরে চেঁচাতে শুরু করল। বিরক্ত হয়ে নিচে তাকালাম শেয়াল দেখার আশায়। তার বদলে দেখলাম সাপ!

ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। হাত-পা হিম হয়ে আসার জোগাড় হলো। কালো কুচকুচে চার-পাঁচ হাত লম্বা এক গোখরো, উঠে আসছে আমি যে গাছটাতে বসেছি সেটাতে। পাখির ডিম খেতে উঠছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ওটাকে ডিঙিয়ে নামার উপায় নেই আমার। গোখরোগুলো খুব পাজি হয়। আমাকে দেখতে পেলে কামড়াতে যে আসবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

অদ্ভুত কায়দায় গাছ পেঁচিয়ে ধরে উঠেই আসছে সাপটা। লিকলিকে, চেরা, কুৎসিত জিভটা মুখের মধ্যে ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। চারপাশ ঘিরে উড়তে উড়তে সমানে চেঁচিয়ে চলেছে শালিকের দল।

দুরুদুরু করছে বুক। কি করব? চিৎকার করে কাউকে ডাকব? কাছাকাছি কোন মানুষই চোখে পড়ল না। যত জোরেই চেঁচাই না কেন, বাড়ি থেকে শুনবে না কেউ আমার ডাক। তাছাড়া চিৎকার করে সাপটার দৃষ্টি আকর্ষণ করাটাও হবে বিপজ্জনক। হাতে অস্ত্র বলতে আছে গুলতি। এই জিনিস দিয়ে অতবড় সাপের কিছুই করতে পারব না। বরং রাগিয়ে দেব। নানীর মুখে শুনেছি, গোখরোর নাকি ভয়ঙ্কর রাগ। সহজে মরেও না। আর কেউ কিছু করলে প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

সাপের অনেক গল্প শুনেছি নানীর মুখে। গল্পের ডিপো ছিল ওই ভদ্রমহিলা। গোখরোর একটা গল্প শুনে তো রীতিমতো কাঁপ ধরে যেত বুকের মধ্যে। একবার কে নাকি ভুল করে কোপ দিয়ে একটা সাপের মাথা কেটে ফেলেছিল। ধড় থেকে আলাদা হয়ে গিয়েও মরেনি মুণ্ডটা। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠল। শরীর নেই, তাই চলতে পারে না। শেষে এক মরা শামুকের খোলের মধ্যে ঢুকল ওটা। গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে হাজির হলো লোকটার বাড়িতে। চৌকিতে ঘুমিয়ে ছিল লোকটা। সেখানে আর উঠতে পারে না মুণ্ডটা। তবু চেষ্টা চালাল। জেগে ছিল লোকটার বৌ। বিচিত্র শব্দ শুনে কৌতূহল হলো তার। আলো জ্বেলে দেখে কি, একটা শামুক চৌকির পায়া বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। উঠতে পারছে না, গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। ডেকে তোলে তখন লোকটাকে। শেষমেষ খোলের ভেতর থেকে মুণ্ডটাকে বের করে থেঁতলে মেরে ফেলে সে। এহেন রোমাঞ্চকর গল্প শোনার পর কিছুদিন রাতে আর পেশাব করতেও বাইরে যাওয়ার সাহস হয়নি।

গাছে কোণঠাসা হয়ে বসে ভয়ঙ্কর সেই গল্প তখন মাথায় ঘুরতে থাকল আমার। কিছুই করার সাহস হলো না। আসলে কিছু করার উপায়ও ছিল না। পাতার আড়ালে যতটা সম্ভব লুকিয়ে গিয়ে চুপ করে বসে সাপটাকে দেখতে লাগলাম।

ধীরে ধীরে উঠে এসে একটা খোড়লে মুখ ঢুকিয়ে দিল সাপটা। পাখিগুলো যেন পাগল হয়ে উঠেছে। চিৎকার করে চলেছে। যে টিয়াটার বাসা ওটা, এসে বসল বাসার কাছে। কিন্তু ঠোকর মারার আর সাহস হচ্ছে না।

দুটো ডিম খেয়ে মুখ বের করল সাপটা। আরেকটু সরে গিয়ে মুখ ঢুকিয়ে দিল

আরেকটা বাসায়।

তারপর আর বেরোয় না।

অপেক্ষা করে আছি। চার চারটে ডিম খেয়ে নিশ্চয় আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে সাপটা। পুরো শরীর দিয়ে গাছটা পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে। মুখটা ভেতরে। ওটাকে ডিঙিয়ে নেমে যাওয়ার কথা ভাবলাম। কিন্তু যেতে সাহস হলো না। যদি জেগে যায়? ঝট করে মুখ বের করে ফেলে? কামড়ে দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কামড় খেলে মাটিতে পড়ে যাব। বিষক্রিয়ায় মরার আগেই মারা পড়ব অত উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে।

মনে মনে গালাগাল করতে লাগলাম নিজেকে। নানী বলত ঠিক-দুপুর-বেলা নাকি সাপ আর শেয়ালের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে চলাফেরা করে শয়তান। আমার তখন মনে হতে লাগল, ওই সাপটার ঘাড়েও নিশ্চয় শয়তান ভর করেছে। খানিক আগে শেয়ালও দেখেছি। আর কোন সন্দেহ নেই, শয়তানের কাণ্ডই এটা। ভীষণ আফসোস হতে লাগল। ইস্, কেন যে নানীর কথা শুনলাম না!

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। পুকুর পাড়ে কার যেন গলা শোনা যাচ্ছে। চিৎকার করে ডাকতে গিয়েও ডাকলাম না। সাপটাকে জাগিয়ে দিয়ে বিপদে পড়তে চাই না।

বসেই রইলাম, বসেই রইলাম। পশ্চিমে ঢলল সূর্য। আমি জানি, অন্ধকার নামার আগে আমাকে খুঁজতেও বেরোবে না কেউ। খোঁজার কোন কারণ নেই। কাউকে কিছু না বলে কয়েক ঘন্টার জন্যে আমার উধাও হয়ে যাওয়াটা গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল বাড়ির সবার। ওভাবে একা একা প্রায়ই বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যেতাম যেখানে সেখানে। কিন্তু হাবিব আর অলিও কি খুঁজতে আসবে না? ওরা নিশ্চয় এতক্ষণে স্কুল থেকে ফিরে ভাত খাওয়া শেষ করেছে।

সাপটাকে দেখে চিৎকার করছিল যে পাখিগুলো, অনেক আগেই চলে গেছে ওরা। কত আর চেঁচাবে? বাঁশের ডালে বসে কর্কশ চিৎকারে কান ঝালাপালা করছে দশ-বারোটা টিয়া। কাছেই কোনখানে নরম গলায় শিস দিচ্ছে হরিয়াল। বিলের পাখিগুলো কেউ একা, কেউ দল বেঁধে উড়ে চলেছে রাতের আশ্রয়ের দিকে।

অন্ধকার হলে আর নামতে পারব না। আর বসে থাকা যায় না। যা করার এখুনি করতে হবে। অন্ধকারে ওই ভয়ঙ্কর সাপের সঙ্গে এক গাছে থাকা আরও বিপজ্জনক। যা থাকে কপালে ভেবে গুলতিটা কোমরে গুঁজে আস্তে সরে এলাম আরেকটা ডালে।

ঠিক এই সময় নড়ে উঠল সাপটা। সর্বনাশ! টের পেয়ে গেল নাকি? বরফের মত জমে গেলাম। আস্তে আস্তে মাথা বের করছে ওটা। পুরো বের করল। ওপর দিকে তাকিয়ে দোলাল কয়েকবার। জিভ বের করল। তারপর ওপর দিকে উঠতে আরম্ভ করল।

দেখেই ফেলেছে বুঝি আমাকে! আতঙ্কে কাঁপতে লাগলাম। মনে হলো, অজ্ঞান হয়ে যাব। কয়েক হাত উঠেই থামল সাপটা। তারপর কি মনে করে মুখ ঘোরাল। নেমে যেতে লাগল নিচের দিকে।

ওটা চলে যাওয়ার পরও কয়েক মিনিট পাথর হয়ে বসে রইলাম। কি জানি, আবার যদি আসে? বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছি।

এই সময় শোনা গেল অলির ডাক। আমাকে ডাকতে ডাকতেই আসছে।

সে রাতে দায়ের আগায় করে কতবার যে নুন খাইয়েছিল আমাকে নানী! ভয় পেলে

নাকি এরকম খাওয়াতে হয়। তাহলে শরীরের আর কোন ক্ষতি হয় না। আমাশা-টামাশা হওয়ার ভয় থাকে না।

কি জানি, নানীর ওই *ধন্বন্তরি* ওষুধের গুণেই হয়তো আমাশা থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম সেবার। কিছু হয়নি আমার। এরপর বহুদিন আর কোণের জঙ্গল মাড়াইনি।

অসংখ্য ঘটনা ঘটে একজন মানুষের জীবনে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। মাঝে মাঝে অলস দুপুরে বিছানায় শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে, কিংবা গভীর রাতে লিখতে বসে যখন কারেন্ট চলে যায়, জানালার বাইরে তাকিয়ে ভাবতে থাকি আমার সেই শৈশব, সেই কৈশোরের সোনালি দিনগুলোর কথা। ছবির মত মনের পর্দায় খেলে যেতে থাকে কত কথা কত স্মৃতি। কোনটা হাসির কোনটা বেদনার। কখনও উদার হয়ে যায় মন, কখনও হাহাকার করে ওঠে। বার বার মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা, হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যায়। কিন্তু তা আর যায় না। মনে হয়, একটিবার, শুধু একটি বারের জন্যে যদি সে সব দিনে ফিরে যেতে পারতাম! যদি কোনমতে হাতে এসে যেত এইচ. জি.ওয়েলসের টাইম মেশিন, সময়কে পেরিয়ে যে যন্ত্র যে-কোন কালে চলে যেতে পারে, তাহলে কতই না ভাল হত! কিন্তু তা আর ঘটে না! ভারি হয় শুধু মন। দীর্ঘশ্বাস পড়ে। নিজের অজান্তেই গুনগুন করতে থাকি তখন ঃ দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি···

****

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan